বঙ্গ কমলবার্তা

এপ্রিল সংখ্যা। ২০২৫

মহারাজ শশাঙ্কের আমলের স্বর্ণ মুদ্রার একপিঠে রয়েছে নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্ত্তি, অন্যপৃষ্ঠে দেখা যায় পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্ত্তি।

বঙ্গাব্দের প্রণেতা সম্রাট শশাঙ্ক

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি!

১৯৪৬	২০২৫
দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস	মুর্শিদাবাদ হত্যাকান্ড

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে

হিন্দু-হিন্দু এক হও

ডঃ আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীতে সংসদ ভবন চত্বরে
তাঁর প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধা।

কৌশলগত অংশীদারি বৃদ্ধি করতে নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে
দুবাইয়ের যুবরাজ এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উপপ্রধানমন্ত্রী।

শ্রীলঙ্কার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'শ্রীলঙ্কা মিত্র বিভূষণ'-এ ভূষিত শ্রী নরেন্দ্র মোদী, সম্মান প্রদান করছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমার দিসানায়েক।

থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে বিমসটেক সম্মেলনে প্রতিনিধি
দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

থাইল্যান্ড সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পালি ভাষায় লেখা ত্রিপিটক
উপহার দিলেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পায়োংটার্ন সিনাওয়াত্রা।

বঙ্গ
কমলবার্তা
এপ্রিল সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪

ধুলাগড় থেকে ধুলিয়ানঃ জেহাদি সন্ত্রাসে শান দিচ্ছে মমতা ৬
স্বাতী সেনাপতি

দেশজুড়ে অবৈধ দখলদারি মুক্ত করতে ওয়াকফ (সংশোধিত) আইন ৯
বিনয়ভূষণ দাশ

স্বাধীন ভারতের সবথেকে বড় নিয়োগ দুর্নীতিতে বিপাকে লক্ষ লক্ষ ১২
অভিরূপ ঘোষ

বাঙালির রাম - রামের বাংলা ১৪
সৌভিক দত্ত

ছবিতে খবর ১৬

বঙ্গাব্দের প্রণেতা বাংলার প্রথম সার্বভৌম সম্রাট শশাঙ্ক ২২
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে? ২৬
পুলক নারায়ণ ধর

অস্তিত্বের শর্ত: সংঘবদ্ধতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা ২৮
কৌশিক কর্মকার

ভারতবিরোধী কম্যুনিস্টদের দ্বিচারিতা ৩১
নারায়ণ চক্রবর্তী

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

অনেক সময় কিছু ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছে জোরালো ভাবে পৌঁছয় না। যাদের পৌঁছে দেওয়ার কথা তাঁরা নিশ্চিত বোঝে, তাঁরা যা দেখছে সেই খবরই সাধারণের কাছে পৌঁছে দিলে প্রবল ঝড়ে খড়কুটোর মত উড়ে যাবে ভয়ের ফানুস। দুর্নীতির জগদ্দল পাথর আর মিথ্যার মুখোশ। আর এই সব উড়ে গেলে মানে রাজার কাপড় উড়ে গেলে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে তাঁদের টিকে থাকার স্বার্থ ফলে রাজশক্তি যে উলঙ্গ এবং রাজধর্ম থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়েছে তা তাঁদের দেখা তো দূরের কথা, ভাবলেও শিউরে ওঠে। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই সাংঘাতিক কান্ডটি অবশেষে নিঃশব্দে ঘটে গেল। খাস কলকাতায়। ভবানীভবনের সামনে। ঘটালেন মাত্র ৫ বিজেপি নেতা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, তাপস রায়, তমোঘ্ন ঘোষ, এবং অর্জুন সিংহ। সঙ্গে মুর্শিদাবাদের সেই ১১ জন হিন্দু বাঙালী যারা ভিটেমাটি হারিয়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। যারা ওয়াকফ সংশোধনী বিরোধী জঙ্গি আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যারা দেখেছেন, চোখের সামনে জঙ্গিরা খুন করেছে প্রতিমাশিল্পী বাবা ও ছেলেকে। পুলিশ এলে হয়ত বেঁচে যেত বাবা-ছেলে। কিন্তু বারেবারে ডাকলেও পুলিশ আসেনি। সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, সুতি, বেতবোনায় ওরা দেখেছে জঙ্গিরা ঘরে ঘরে ঢুকে হিন্দু বাঙালী মা-বোনেদের অত্যাচার করেছে। ঘরে ঘরে আগুন লাগাচ্ছে। প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিয়েছে একটি গোটা পরিবার। সরকারি সম্পত্তি তছনছ করা হয়েছে। লুঠ হয়েছে। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা ডেকেও পুলিশকে পাওয়া যায়নি। কেন আসেনি পুলিশ? এই প্রশ্ন নিয়েই বিজেপি রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে ওরা গিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি-র সঙ্গে কথা বলতে। চারিদিকে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ অথচ কেউ একবারের জন্যও ওই ১৬জন-কে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, চোখ লাল করারও সাহস দেখাল না। ডিজি সাহেবকে তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। নাছোড় নেতারা ১১ জনকে নিয়ে রাস্তায় বসে পড়ে বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা ফিরে যাওয়ার জন্য আসেননি। শেষমেশ ডিজি বাধ্য হলেন দেখা করতে এবং স্বীকার করে নিলেন যে পুলিশ সংখ্যায় কম ছিল তাই ডাকলেও যেতে পারেনি সেদিন। মানে মুর্শিদাবাদে ওই জঙ্গি তাণ্ডবে পুলিশ-প্রশাসনের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিল। মাত্র কয়েক ঘন্টার চোয়াল চাপা প্রতিরোধের ফলাফল যদি এই হয় তাহলে আগামী দিনে তো বিরাট সুনামি অপেক্ষা করছে। সময় কি আসন্ন?

স্বর্ণময়-পদ্মশোভিত সরোবরে যক্ষ-কে উত্তর দেওয়া যুধিষ্ঠিরের কথা মনে পড়ছে - যদি আমি ধর্ম নষ্ট করি তবে ধর্মই আমাকে বিনষ্ট করবেন।

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

"একজন মহিলা সাংবাদিক একবার অটলজিকে বলেছিলেন যে তিনি যদি তাকে যৌতুক হিসেবে কাশ্মীর দেন তবে তিনি তাকে বিয়ে করবেন। অটলজি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যৌতুক হিসেবে যদি আপনি পুরো পাকিস্তান নিয়ে আসেন তবে আমি প্রস্তুত ...... শ্রদ্ধেয় অটলজির ব্যক্তিত্ব এতটাই উচ্চমানের ছিল যে তাঁর নেতৃত্বের ধরণ এবং সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। অটলজির হৃদয়ে লখনউয়ের একটি বিশেষ স্থান ছিল এবং লখনউয়ের মানুষ তাঁকে গভীরভাবে বুঝতেন। আমি তাঁর নেতৃত্বে এবং মন্ত্রিসভার সহকর্মী হিসেবে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। যখন তাঁর সরকারের মাত্র এক ভোটে পতন ঘটে, তখন অটলজির ঐতিহাসিক ভাষণ দেশপ্রেম এবং গণতন্ত্রকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত ভাষণে বলেছিলেন, 'সরকার আসবে এবং যাবে, দল তৈরি হবে এবং ভেঙে যাবে, কিন্তু এই জাতি এবং এই দেশের গণতন্ত্র অটুট থাকবে।' - তাঁর নির্বাচিত শব্দমালা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং অটল নীতির প্রমাণ ছিল।"

– রাজনাথ সিং, 'অটল যুব মহাকুম্ভ', লখনউ, ডিসেম্বর ২০২৪।

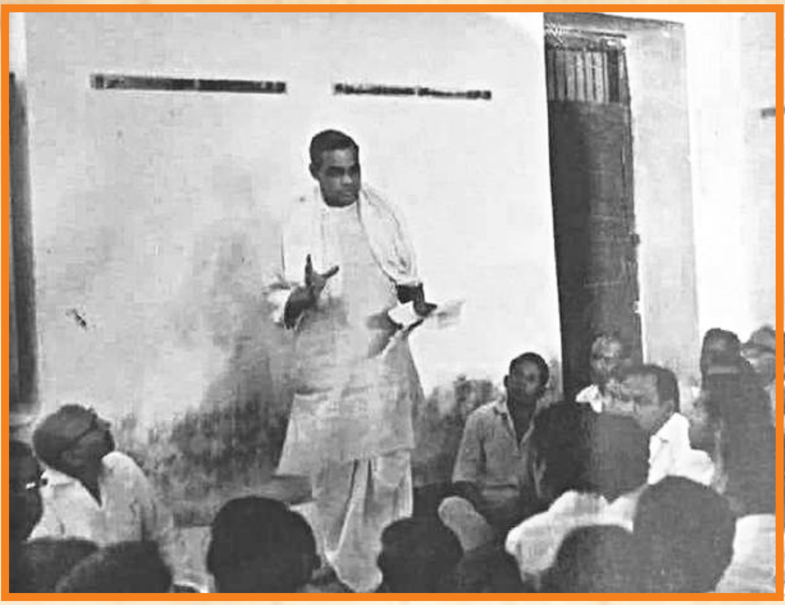

বলরামপুরের ধর্মশালায় অটলবিহারী বাজপেয়ী।

"অটলজির জামশেদপুর থেকে ধানবাদ যাওয়ার কথা ছিল। যেতে হতো আমাদের বলরামপুর ছুঁয়েই। কিন্তু এখানে তাঁর কোনও কর্মসূচি ছিল না। এ দিকে, সমস্ত নেতা-কর্মী চাইছেন, তিনি গ্রামে আসুন। সালটা ১৯৬৮। অটলবিহারীজী তখন জনসঙ্ঘের সহ-সভাপতি। বলরামপুর থেকে জামশেদপুর বেশি দূর নয়। জামশেদপুরে পৌঁছে গেলেন জনসঙ্ঘের নেতা বিশ্বনাথ ঘোষ, মিতন সেন, রামঅবতার শর্মা, সীতারাম নিয়োগী, প্রমোদ কাটারুকারা। সবাই মিলে নেতৃত্বের কাছে অনুরোধ করলেন, বাজপেয়ী জী যেন একটি বার গ্রামে আসেন।

তখন বেলা ১১টা-সাড়ে ১১টা হবে। আমরা সবাই রাস্তায় পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ওঁর গাড়ি আসতেই ছেলেরা পথ আটকায়। সঙ্ঘের পতাকা দেখে উনি নেমে আসেন। রাস্তার ধারে সরাফ ধর্মশালায় যেতে অনুরোধ করেন সবাই। উনি সানন্দে যেতে রাজি হয়ে যান। বাজপেয়ী শুধু একগ্লাস জল খেয়েছিলেন। মিনিট দশেক বক্তৃতাও দেন। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটি স্মারকলিপি। বলরামপুরের লাক্ষা শিল্পে বিক্রয় কর প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছিল। উনি সেই দাবি সংসদে তুলেছিলেন। পরে বিক্রয় কর প্রত্যাহার হয়ে যায়।"

–প্রমোদ কাটারুকারা ২০১৮।

ধুলাগড় থেকে ধুলিয়ান জেহাদি সন্ত্রাসে শান দিচ্ছে মমতা

স্বাতী সেনাপতি

তৃণমূলের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা যখন বলল, "প্রথমে জেলাগুলোকে টাইট দেব, তারপর কলকাতাকে স্তব্ধ করব," মমতা চুপ। এরপর যখন সিদ্দিকুল্লা বাহিনী হুমকি দিল, "দিদির দয়ায় আমরা বেঁচে নেই, দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। যদি আমাদের স্বার্থ রক্ষা না হয় তাহলে দিদিকেও আমরা ছেড়ে কথা বলব না।" চুপ করে থাকলেন মমতা। এরপরই শুরু হয় মুসলমান প্রধান এলাকায় নির্মম হিন্দু নির্যাতন। কে নেবে এর দায়? সিদ্দিকুল্লা না সিদ্দিকুল্লার নেত্রী?

"আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আমি পাকিস্তানকে টুকরো করলাম" - ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

ঠাঁই নাড়া হিন্দু বাঙালির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, লড়াই করে একটি মাথা গোঁজার স্থান তৈরি করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ১০০ বছরও হয়নি তার আগেই ফের যেন উদ্বাস্তু হতে হচ্ছে হিন্দু বাঙালিকে। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হল? ৩৪ বছরের বাম অপশাসন এবং তারপর তোষণকারী তৃণমূল, এই দুইয়ের কারণে আজ আবারও একবার অস্তিত্ব বিপন্ন হিন্দু বাঙালির। বাংলা জুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো সাম্প্রতিক জেহাদি তান্ডব আসলে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এর শিকড় বুঝতে গেলে আমাদের আরও কিছু বছর পিছিয়ে যেতে হবে।

ধুলাগড় ২০১৬

সালটা ২০১৬-এর ডিসেম্বর। বছর তিনেক আগে বদলা নয় বদলের চমকদার ডাক দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আমার বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরে ধুলাগড়ে তখন দাঙ্গার দগদগে ঘা। হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করে , আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনের কেবল একটাই ভূমিকা ছিল - কোনওভাবে খবর যাতে বাইরে না আসে সেটার ব্যবস্থা করা। সেই কাজে প্রশাসন সার্বিকভাবে সফলও হয়েছিল। একটা সংবাদ মাধ্যমে খবর হয়নি, কোথাও এর বিরুদ্ধে সেভাবে কোনও সংঘটিত প্রতিরোধ হয়নি। ঠিক যেন বাংলাদেশের প্রশাসনের বি টিম তৃণমূল। বাংলাদেশে যে কায়দায় পুলিশের সামনেই

হিন্দু হত্যা হয়, খবর বাইরে আসতে দেওয়া হয় না সেই একই কায়দা এখানেও বারবার দেখা গেছে তৃণমূলের শাসনে।

ক্যানিং ২০১৩

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরপরই ২০১৩ সালে ক্যানিংয়ে দাঙ্গা হয়েছিল। ২০১৩, ২০১৬ এর পরপরই মুসলিম দুষ্কৃতীরা বুঝে গেছিল দুধেল গাইদের স্নেহ, প্রশ্রয় দিয়েই আগলে রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও এই ঘটনা পরম্পরাগুলিকে দাঙ্গা বলা কতটা যুক্তিযুক্ত আমার জানা নেই। দুই জুজুধান পক্ষ যখন সমানে সমানে লড়াই করে তখন তাকে দাঙ্গা বলা যায়। কিন্তু এই যে অতর্কিত আক্রমণ, লুঠপাট, হামলা, অত্যাচার একে দাঙ্গা বলা যায় না। জেনোসাইড বললেই বরং বেশি মানানসই হয়।

যাইহোক এবার ফিরে আসা যাক বর্তমান পরিস্থিতিতে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতার নামে যে হিংসা শুরু হয়েছে বিগত এক সপ্তাহ ধরে তাতে সরাসরি ইন্ধন যোগাচ্ছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনা পরম্পরা দেখলেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। রেড রোড থেকে ঈদের নামাজের পরে উস্কানি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভাইপো। তার দিন তিনেক পর পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাশ হল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। তারপরই শুরু হল এই রাজ্যে তৃণমূল এবং তৃণমূল পোষিত জেহাদিদের আক্রমণ। রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর বক্তব্য “প্রথমে জেলাগুলোকে টাইট দেব, তারপর কলকাতাকে স্তব্ধ করব।” না মুখ্যমন্ত্রী তখনও কিছু বলেননি বরং তিনি সেই সময় শান দিয়েছেন সন্ত্রাসী অস্ত্রে। ইমাম-মোয়াজ্জেমদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন কিভাবে এই জেহাদকে আরও তীব্রতর করা যায়। তার ফলশ্রুতিতে আমরা কি দেখলাম ! ১০ এপ্রিল মহাবীর জয়ন্তীর দিন স্তব্ধ করা হল কলকাতা, অবরোধ করা হল একাধিক জাতীয় সড়ক এবং রেলপথ। সেই মিছিল থেকে ডাক দেওয়া হল আরও বৃহত্তর

ষড়যন্ত্রের। সেদিন বিকেল থেকে শুরু হল জেহাদি তান্ডব। মিছিল থেকে দাবি উঠল রাজভবন, ইডেন গার্ডেন মায় অর্ধেক কলকাতাই নাকি ওয়াকফের সম্পত্তি। হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে মহাদেবের স্টিকার লাগানো গাড়িতে ভাঙচুর করা হল, জোর করে খোলানো হল গেরুয়া পতাকা।

পরবর্তীতে কোনও এক জেহাদি সভা থেকে বীরপুঙ্গব সিদ্দিকুল্লাকে এও বলতে শোনা যায় কলকাতায় প্রতিবাদের নামে যে জমায়েত হয়েছিল সেই জমায়েতের ভিড়ের পরিমাণ দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন জমায়েত হোক, প্রতিবাদের নামে আগুন জ্বলুক। এরপরই মালদার কালিয়াচক, একে একে মুর্শিদাবাদের ধূলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার আমতলা, হুগলির চাঁপদানি সহ নানা জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হল এই

তাণ্ডব। আমতলায় পুলিশের গাড়িতে ভাংচুর করা হল, মার থেকে রেহাই পেল না উর্দিধারী পুলিশও। চলল ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ। মুর্শিদাবাদে খাবার জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হল যাতে তেষ্টার জলটুকু না পায় হিন্দুরা। এক কাপড়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে নৌকা করে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিল হিন্দুরা।

এ যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আমরা ১৯৪৬ এর হিন্দু গণহত্যা দেখিনি, দেখিনি ১৯৭১ এর নিপীড়নও। কিন্তু যেন হুবহু সেই চিত্র ফুটে উঠছে। যার উপলক্ষ্য ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে আন্দোলন হলেও আসল লক্ষ্য হল মালদা, মুর্শিদাবাদের মত পশ্চিমবঙ্গের যে সকল জায়গায় হিন্দুর সংখ্যা কমে গেছে সেখান থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে বা প্রয়োজনে মেরে ফেলে সম্পূর্ণ এলাকা হিন্দু শূন্য করা। মুর্শিদাবাদ থেকে দুধের শিশু, কচি কাঁচাদের নিয়ে এক বস্ত্রে রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে মালদায় এসে রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়ার দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তুদের পালিয়ে আসার দৃশ্যই। এক মুহূর্তে নিজের দেশেই হিন্দুদের উদ্বাস্তু করল কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ এই সকল কাজে মদত যোগাচ্ছেন স্বয়ং মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি জানেন, সংখ্যালঘু ভোটেই তিনি ক্ষমতায় টিকে আছেন, আর তাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে নেই। তাই প্রকাশ্যে মুসলিমরা তাকে হুমকি দেয় “দিদির দয়ায় আমরা বেঁচে নেই, দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। যদি আমাদের স্বার্থ রক্ষা না হয় তাহলে দিদিকেও আমরা ছেড়ে কথা বলব না।” আর এগুলি হজম করতে হয় এবং তড়িঘড়ি বারবার ঘোষণা করতে হয় “এই রাজ্যে ওয়াকফ সংশোধনী আইন লাগু হবে না। তাহলে কিসের দাঙ্গা!? দয়া করে দাঙ্গা করবেন না।”

পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী চায়নি এই সরকার। কলকাতা হাইকোর্টে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির পরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী

জিহাদি তাণ্ডবের পর শামসেরগঞ্জে মায়েয় চোখে জল।

নিয়ে নানা টালবাহানা করা হয়। এমনকি তৃণমূলের কুণাল ঘোষ সরাসরি দাবি করছেন বিএসএফই নাকি বাইরে থেকে দুষ্কৃতী ঢুকিয়ে গণ্ডগোল করছে! এতকিছুর পরেও মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ বলতে শ্রেফ একটা টুইট! যে টুইটে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের বাকি অংশকে আলাদা করে দেখানোর প্রয়াস, যে ট্যুইটে আশ্বাস ভারতের অন্যান্য প্রান্তে ওয়াকফ আইন কার্যকর হলেও পশ্চিমবঙ্গে হবে না।

সবথেকে মজার ব্যাপার দেখুন সিএএ বিরোধী আন্দোলন হোক বা ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলন - সবার আগে হিন্দু বাড়িঘর পোড়ে, হিন্দুরা ভিটে ছাড়া হয়। ওয়াকফের সাথে হিন্দুদের কি সম্পর্ক? যে দুজন মৃৎ শিল্পী পিতা, পুত্রকে কুপিয়ে খুন করা হল তাঁদের সঙ্গে ওয়াকফের কি সম্পর্ক? আসলে বিষয়টি প্রতিবাদের নয়, বিষয়টি যে কোনও বাহানায় হিন্দু নিধন যজ্ঞ করা। আর এক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার যে মুখে কুলুপ এঁটেই থাকবে সেটাও বুঝে গেছে জিহাদিরা। এই সরকারের অ্যাসিড টেস্ট হয়ে গেছে। কারণ শুধু ওয়াকফ বা সিএএর প্রতিবাদ বলেই নয়, বিগত কয়েক বছরে যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হিন্দুদের উপর হামলা হয়েছে, মূর্তি ভাংচুর হয়েছে। দুর্গাপূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা মায় কার্তিক পূজাও (বেলডাঙা) রেহাই পায়নি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আজ পর্যন্ত কোনও দাঙ্গাকারীর শাস্তি হয়নি। সার্বিক চিত্র কিন্তু আরও ভয়াবহ। আরটিআই তথ্য বলছে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ৬৫ টি হিন্দু নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। ২০২২ সাল পেরিয়ে আমরা ২০২৫-এ পা দিয়েছি। ঘটনার সংখ্যা আরও কয়েক গুণ বেড়েছে এই নিয়ে সন্দেহ নেই। আর নিজের ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ন রাখতে জেহাদি অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গ বাদে সমগ্র দেশ জুড়ে আরও কোথাও ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদের এমন ভয়াবহ রূপ দেখতে পাওয়া যায়নি। উত্তরপ্রদেশে ওয়াকফের সবথেকে বেশি সম্পত্তি রয়েছে, সেখানে কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি। আসামের মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৪০% সেখানেও এই ধরণের একটিও ঘটনা ঘটেনি। প্রশ্ন হল তাহলে একদা হিন্দু হোমল্যান্ডই কেন বারবার জিহাদী ল্যান্ড হয়ে উঠছে?

উত্তরটাও সহজ। শাসক চাইছে বলে। এ কথা এখন দিনের আলোর মত পরিস্কার, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্তে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। আর শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বা দোষ দিই কেন। ২০২১ এ নির্বাচনের আগে যে সব সুশীল বামপন্থী লেসার ইভিল থিওরি আউড়েছিল, নোভোটু বিজেপির মত ক্যাম্পেইন চালিয়েছিল রক্ত তো তাদের হাতেও লেগেছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালির এই দুরবস্থার দায় তাদেরকেও নিতে হবে। অবশ্য অন্তঃসারশুন্য, তোষণ সর্বস্ব সুশীল বামপন্থী সমাজ যে হিন্দুদের নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নয় তার বহু প্রমাণ আমরা আগেও পেয়েছি।এমনকি যে দুজনকে খুন করেছে মুসলিম জিহাদিরা (পিতা - হরগোবিন্দ দাস, পুত্র - চন্দন দাস) সেই দুজন বামপন্থী কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম সিপিএমের প্রথম বিবৃতিতে ছিলই না!

বিগত ৩৪ বছরে তাদেরই মদতে ধীরে ধীরে বেড়েছে অনুপ্রবেশ, মাথায় উঠেছে সংখ্যালঘুরা। যে বিষবৃক্ষ বামপন্থীরা পুঁতেছিল সেই বৃক্ষকেই জল দিয়ে, সার দিতে বড় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার ফল আজ আবারও অস্তিত্ব সংকটে আমরা। জল বইছে বিপদ সীমার উপর দিয়েই। কাজেই যা করতে হবে আমাদেরই করতে হবে। সচেতনভাবে লড়াই করতে হবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য। কারণ হিন্দু বাঙালির প্রতিপক্ষ কেবল জেহাদি নয়, জেহাদে মদত দেওয়া তৃণমূল, বাম, কংগ্রেস, সবাই। আর নাহলে আবারও ব্যাগ, বোঁচকা নিয়ে পাড়ি দিতে হবে অন্য কোনও রাজ্যে, অন্য কোনও স্থানে! কাশ্মীরি পন্ডিত, বাস্তুহারা বাংলাদেশি হিন্দুদের মতই বলতে হবে “আমাদেরও একখানা দেশ ছিল!”

দেশজুড়ে অবৈধ দখলদারি মুক্ত করতে
ওয়াকফ (সংশোধিত) আইন ২০২৫

বিনয়ভূষণ দাশ

আইনের ছাত্রী-একদা কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানেন, এই 'ওয়াকফ আইনের' কথা কিন্তু ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারিতে গৃহীত সংবিধানে নেই। আইনটি আসলে অসাংবিধানিক। মুসলিম মহিলা ও দরিদ্র মুসলমানের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে ওয়াকফ (সংশোধিত) আইন ২০২৫- এতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি কেন?

সম্প্রতি 'ওয়াকফ আইন (সংশোধন) বিল, ২০২৪ সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে বিলটি এখন আইনে পরিণত হয়েছে। যদিও এই বিলের বিরোধিতা করে দেশের মুসলিম মানসিকতার ধাঁচটা বুঝে নিতে চাইছে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া, কেরালার সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বাড়ুজ্যে, বিহারের তেজস্বী যাদব এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের জমি, সম্পত্তি অবৈধভাবে কুক্ষিগত করার হাতিয়ার ছিল এই ওয়াকফ আইন

তামিলনাড়ুর তিরুচেনথুড়াই গ্রামের এক চাষী, রাজাগোপাল ঋণ শোধ করার জন্য তাঁর কৃষিজমি বিক্রয় করতে পারেননি; কারণ ওয়াকফ বোর্ড তাঁদের সম্পূর্ণ গ্রামটিই 'ওয়াকফ' সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে দিয়েছে।

আবার ব্যাঙ্গালুরু ঈদগা ময়দানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে,সরকারী নথিতে এই ময়দানটি কোন মুসলিম সংস্থাকে হস্তান্তরিত করার কোন প্রমাণ বা দলিল না থাকলেও ওয়াকফ বোর্ড দাবী করেছে, ওই ময়দান নাকি ১৮৫০-এর দশক থেকেই ওয়াকফ সম্পত্তি; সুতরাং এটি আল্লার জমি।

সম্প্রতি গুজরাত ওয়াকফ বোর্ড সুরাট মিউনিসিপ্যাল ভবনকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবী করেছে। ওয়াকফ বোর্ডের দাবী, মুঘল আমলে এই স্থানে একটি সরাই ছিল এবং সেটি ওয়াকফ সম্পত্তিই ছিল এবং এটি হজযাত্রীদের জন্য ব্যবহার করা হত। পরে স্থানটি ব্রিটিশদের হাতে চলে যায়। সেখান থেকে স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারত সরকারের অধীনে আসে। কিন্তু দলিলপত্র যেহেতু ইদানীন্তন (আপডেট) করা হয়নি তাই এটি ওয়াকফ সম্পত্তি হয়ে যায়, কারণ Once Waqf, always Waqf , অবশ্য এখন বিলটি পাশের পর আর বলা যাবে না, Once Waqf, always Waqf.

একই অবস্থা গুজরাতের ভেট দ্বারকা দ্বীপ বা সুরাটের শিবশক্তি সোসাইটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিবশক্তি সোসাইটির বিষয়টি তো ভীষণই চিন্তার। এই সোসাইটির একটি অ্যাপার্টমেন্ট মালিক তাঁর জমিটি গুজরাত ওয়াকফ বোর্ডকে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে স্থানটিকে মুসলিমদের জন্য পবিত্র বলে ঘোষণা করে দেয়। আর মুসলিমরা এখানে নামাজ পড়া শুরু করে দেয়। এর অর্থ, কোন হাউসিং সোসাইটির একটি অ্যাপার্টমেন্ট

প্রতিবেশীদের অজ্ঞাতেই একটি মসজিদে রূপান্তরিত হতে পারে। অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

কিছুদিন আগে কেরালার উপকূলবর্তী এর্ণাকুলাম জেলার ৬১০টি পরিবারের জমি তাঁদের বলে দাবী করে ওয়াকফ বোর্ড বিজ্ঞপ্তি জারী করে। ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায় প্রকাশ্যে ওয়াকফ বোর্ডের এই দখলদারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, কেরালার ক্যাথলিক চার্চ গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত ওয়াকফ সংশোধন আইন ২০২৫ কে সমর্থন করেছে এবং তাঁরা আশা করে আছে, ওয়াকফ বিল ২০২৫ পাশ হওয়ায় তাঁরা আবার তাঁদের হৃত সম্পত্তি ফেরত পাবেন। ৬১০ টি পরিবারের জমি দখলের বিষয়টি বর্তমানে কেরালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচারাধীন।

এই কালো আইনের সাহায্যে হিন্দুদের মালিকানাধীন হাজার হাজার একর জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি, সম্প্রতি তামিলনাড়ু ওয়াকফ বোর্ড ওই রাজ্যের ৬টি গ্রামসহ একটি ১৫০০ বছরের পুরাতন হিন্দু মন্দিরকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এখানে মজার ব্যাপার হল, ১৪০০ বছরের পুরনো একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী ১৫০০ বছরের পুরনো একটি হিন্দু মন্দিরকেও 'ওয়াকফ' হিসেবে ঘোষণা করতে পারে এই দেশে! এমনকি, আমাদের এই রাজ্যের মুর্শিদাবাদসহ কয়েকটি জেলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে বেশ কিছু সরকারী সম্পত্তিকে ভূমি রাজস্ব দফতরের রেকর্ডে কোন অদৃশ্য হাতের অঙ্গুলিহেলনে ওয়াকফ এবং মসজিদের জমি হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় এই জেলাই এখন শীর্ষ সংবাদে উঠে এসেছে।

সীমাহীন ক্ষমতা পেল কি করে ওয়াকফ?

ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ একটি প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্টার দলিল। আইনটি প্রথমে ভারতবর্ষে চালু করেন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। আইনটি চালু করা হয় মুসলিমদের মসজিদ, কবরখানা, দরগা ইত্যাদি যথাযথ পরিচালনার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে। অবশ্য এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে, ওয়াকফ সংক্রান্ত আইন ব্রিটিশ আমলেও চালু ছিল, একটু অন্যভাবে। এই ১৯৫৪ সালের আইনটির স্থানে পরবর্তীকালে 'ওয়াকফ আইন ১৯৯৫, চালু করা হয় কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওয়ের আমলে। এবং তাঁর আমলেই সেই ওয়াকফ আইন সংশোধনের মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডকে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী করে দেওয়া হয়।

২০১৩ সালে এই আইনটি সংশোধন করে ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে যে কারও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার সীমাহীন অধিকার দেওয়া হয়। আর ওয়াকফ বোর্ডের এই দখলদারিত্ব দেশের কোন বিচারালয়ে 'চ্যালেঞ্জ' করাও নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি এই আইনের বলে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দিল্লীর ১২৩টি বহু মুল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডকে 'ভেট' দেয়; যদিও তাতে ভবি ভোলেনি; ঐ নির্বাচনে কংগ্রেস গোহারা হেরে যায়।

ওয়াকফ ইতিহাস

হিন্দুরা দেশভাগের পরে পাকিস্তান থেকে বিভক্ত দেশের এই অবশিষ্ট অংশে এল তাঁদের উত্তরাধিকার সুত্রে অর্জিত সমস্ত ফেলে। সেই সমস্ত সম্পত্তি পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশের সরকার ও মুসলমানেরা দখল করে নেয়; অনেকটা গণিমতের মালের মত। কিন্তু আমাদের দেশের মহান ধর্মনিরপেক্ষ, মহানুভবতার ভেকধারী জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস সরকার ভারতে পরিত্যক্ত মুসলিম সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডকে সমর্পণ করে অধিগ্রহণ না করে। Waqf Management System of India-র প্রদত্ত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়,বর্তমানে ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের মোট সম্পত্তি ৮৫৪৫০৯ টি। আর এই সম্পত্তিগুলি মোট নয় লাখেরও (৯.৪ লাখ)বেশী একর জমির উপর ছড়িয়ে আছে। আরও অবাক করার বিষয় হল, এই পরিমাণ জমি দেশে সৈন্য বিভাগ ও রেল বিভাগের পরেই। আরও স্তম্ভিত হওয়ার বিষয় হল, বর্তমান পাকিস্তানের মোট জমির আয়তনের থেকেও অনেক বেশী জমি ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের এক্তিয়ারে আছে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ও অন্যান্য রাজ্য সরকারের বদান্যতায়। রেজিস্ট্রিকৃত মোট ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে ৭% দখলীকৃত, ২% বিবাদাস্পদ এবং ৫০ % স্ট্যাটাস অজ্ঞাত। আর মোট ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে উত্তরপ্রদেশে আছে ২৭%, পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে আছে ৯ % করে; আর বাকিটা আছে অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

ভারতের মধ্যেই পাকিস্তানের চেয়েও বড় একটি পাকিস্তান অবস্থান করছে

২০০৯ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ওয়াকফ সম্পত্তি চার লাখ একরেরও বেশী জমির উপর ছড়িয়ে আছে। আর সেই জমির পরিমাণ এরই মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অথচ দেশের মোট জমির পরিমাণ একই আছে। তাহলে কোথা থেকে ওয়াকফ বোর্ডের অধীন জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হল ? আসলে ওয়াকফ বোর্ড যে কোনও সম্পত্তি, তা সে সরকারের হোক, অথবা কোন হিন্দু বা খ্রিস্টানের হোক, মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে অধিকার করে নিচ্ছে। কখনও ওয়াকফ বোর্ড কবরখানার সংলগ্ন সরকারী বা হিন্দুদের জমি ঘিরে নিয়ে তাকে ওয়াকফ হিসেবে দেখাচ্ছে; আবার কখনও ভগ্ন দেবালয় বা মসজিদ মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে ওয়াকফ হিসেবে চিহ্নিত করে নিচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সংলগ্ন অঞ্চলেও এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। এইভাবে অবৈধভাবে জমি দখল করা মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা অংশকে কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহক করে রেখেছে।

ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এর সেকশন ৩-এ বলা হয়েছে, যদি ওয়াকফ বোর্ড মনে করে যে, কোন জমি কোন মুসলমানের,

তাহলে সেই জমি স্বাভাবিকভাবেই ওয়াকফ সম্পত্তি। আর এ ক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ডের মনে করাটাই যথেষ্ট, কোন প্রমাণের দরকার নেই। যদি ওয়াকফ বোর্ড ভাবে যে, আপনার সম্পত্তি আপনার নয়, ওয়াকফের; তাহলে সেটি ওয়াকফের বলেই গন্য হবে, আপনি এমনকি কোন আদালতেও যেতে পারবেন না; আপনাকে যেতে হবে সেই ওয়াকফ বোর্ডের কাছেই, যারা আপনার জমি বা সম্পত্তি ' অবৈধভাবে ওয়াকফ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, তাঁদেরই দয়ার উপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে।

পূর্বোক্ত ওয়াকফ আইনের ৮৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, No suit or other legal proceeding shall lie in any (civil court, revenue court and any other authority) in respect of any dispute, question or other matter relating to any (waqf) property or other matter which is required by or under this Act to be determined by a Tribunal(constituted by Waqf Board). অর্থাৎ, যদি আপনি ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে প্রমাণ করতে না পারেন যে জমিটি আপনার তাহলে আপনাকে জমিটি খালি করে দিতে হুকুম দেবে ওয়াকফ বোর্ড। আর এক্ষেত্রে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোন বিচারালয়, এমনকি সুপ্রিম কোর্টও ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবে না। অর্থাৎ, ওয়াকফ বোর্ড যদি কোন জমি তাঁদের বলে ঘোষণা করে, তাহলে ওয়াকফ বোর্ডই সেই জমির মালিক বনে যাবে।

মজার ব্যাপার হল, এই আইন ভারতে থাকলেও বিভিন্ন মুসলিম দেশ যেমন তুরস্ক, লিবিয়া, মিশর, সুদান, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন বা ইরাকের মত মুসলিম দেশে কিন্তু কোন ওয়াকফ বোর্ড বা ওয়াকফ আইন নেই। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আফতাব আলম এক প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, ওয়াকফ বোর্ডে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না, ওয়াকফ বোর্ডের প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত বেহাল এবং তা দ্রুত সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, ওয়াকফ বোর্ড দেশের তৃতীয় বৃহত্তম জমি মালিক। যদিও মোটের উপর তিনি পূর্বতন আইনটির পক্ষেই।

কি বলা হয়েছে ওয়াকফ (সংশোধনী) ২০২৫ আইনে

ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন ২০২৫- এর উদ্দেশ্য হল ওয়াকফ বোর্ডের ৮.৭ লক্ষের বেশী ওয়াকফ সম্পত্তির কাজে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা আনা। এ ছাড়া ওয়াকফ বোর্ডকে দুর্নীতিমুক্ত করা। বিলটিতে অমুসলিমকেও ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য করার বিধি রাখা হয়েছে। কোন সম্পত্তিকে 'ওয়াকফ' ঘোষণা করা হবে সেটা নির্ধারণের ব্যাপারে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের স্থানে জেলা কালেক্টরকে প্রভুত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোনও সরকারি সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষিত হয়ে থাকলে সেটা নতুন আইনে আর ওয়াকফ সম্পত্তি থাকবে না। নতুন এই আইনে ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এর ৪০(৩)নং অনুচ্ছেদটি যাতে ওয়াকফ বোর্ডকে যে কোন সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাও রদ করা হয়েছে। এই আইনটির মাধ্যমে প্রায় ৭৩,১৯৬টি বিবাদাস্পদ সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে ওয়াকফ ঘোষণার অনুচ্ছেদটিও বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া এক বিশাল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে যার কোন বৈধ দলিলপত্তর নেই, যেগুলি বিভিন্ন সময়ে জোর করে ওয়াকফ বলে দখল করা হয়েছে। পাশ হওয়া এই আইনে বৈধ ওয়াকফনামা না থাকলে তাকে (সেই সম্পত্তিকে) বিবাদিত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জেলা কালেক্টরকে দেওয়া হয়েছে। এই আইনে আরও নানা সংস্থান রাখা হয়েছে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের শেষ শুনানিতে বলা হয়েছে, পরবর্তী শুনানির আগে বোর্ড বা পরষদে নিয়োগ করা যাবে না।

মুসলিম মহিলা ও দরিদ্র মুসলমানের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে ওয়াকফ আইন ২০২৫

এই আইন কিন্তু বাস্তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই সুরক্ষিত করবে। বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে। আর সুরক্ষিত করবে দরিদ্র মুসলিমদের স্বার্থ। প্রস্তাবিত ওয়াকফ বিলে (এখন আইনে পরিণত) ওয়াকফ সম্পত্তির সুস্থ পরিচালন এবং যে উদ্দেশ্যে ওয়াকফ গঠন করা হয়েছে, অর্থাৎ মুসলিম সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ধর্মীয় প্রয়োজনগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে ওয়াকফ সম্পত্তি দায়িত্বপ্রাপ্তরা নিজেদের স্বার্থে অবৈধ উপায়ে কুক্ষিগত করেছে, রাজনৈতিক স্বার্থের তল্পিবাহক নেতারা এই সম্পত্তি অবৈধভাবে ব্যবহার করেছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে ওয়াকফ আইন সংশোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে সাধারণ মুসলিমদের কোন সুরাহা হয়নি। নতুন এই আইনে সাধারণ মুসলিম এবং মুসলিম মহিলাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া এই আইনে দুর্নীতি, পরিচালনায় অব্যবস্থা এবং অবৈধভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করাও রুখবে। তাছাড়া ওয়াকফ সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেসন করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে এই নতুন আইনে। নতুন আইনের ৩এ ধারায় বলা হয়েছে, কেউ কোন সম্পত্তির বৈধ মালিক না হলে তিনি কোন ওয়াকফ সৃষ্টি করতে পারবেন না। 'ব্যবহারের দ্বারা ওয়াকফ' বিষয়টিও তুলে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র বৈধ দলিলের মাধ্যমেই ওয়াকফ সৃষ্টি করা যাবে নতুন আইনে।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল, কোন সরকারী সম্পত্তি অবৈধভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না যেটা একসময় দিল্লীতে ১২৩টি ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তাছাড়া, সুরাট পুর নিগমের বিষয়টি তো আছেই। আর ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এর ৪০ ধারা অনুযায়ী যে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ বলে ঘোষণার যে ক্ষমতা ওয়াকফ বোর্ডকে দেওয়া হয়েছিল সেই ৪০ নং ধারাও।

চাকরি চোর সরকার আর নেই দরকার

অভিরূপ ঘোষ

আসলে রাজ্য সরকার বারবার চেয়েছে যোগ্য-অযোগ্য গুলিয়ে দিতে যাতে করে হয় সবার চাকরি যায় নয়, সবার চাকরি থেকে যায়। এমনিতেই এই মামলায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী, এসএসসি চেয়ারম্যান, পর্ষদ চেয়ারম্যান সবাই জেলে ঢুকেছে। এরপর দলের অধিকাংশ নেতা মন্ত্রী সমেত ওনার স্থির করে যাওয়া উত্তরসূরীও যদি জেলে যায় তবে তার সাজানো সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে মুহূর্তে!

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম। ৬-৭ বছর চাকরি করার পর কাজ হারালেন একসঙ্গে ২৬০০০ জন। কারণ এক এবং একমাত্র তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি। তৃণমূল এবং তার দোসর বামেরা অবশ্য ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সিস্টেম এবং আদালতকে দায়ী করার চেষ্টা করছে। তবে তা সফল হওয়ার নয়। সাধারণ মানুষ এতদিনে বুঝে গেছে মমতা ব্যানার্জির সরকার দুর্নীতি, তোলাবাজি আর প্রহসন ছাড়া কিছুই পারে না। উনি ভেবেছিলেন অন্যবারের মতো এবারও বিজেপিকে ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের দুর্নীতি ঢাকবেন তিনি। আপাতত সেটা হচ্ছে না। কয়লা, বালি, পুকুর, ডিএ, পাথরের পর নিজেদের ডাকাতির (চুরি বললে এবার চোরও লজ্জা পাবে তাই) তালিকায় তৃণমূলের নতুন সংযোজন চাকরি।

তৃণমূলের এই দুর্নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার আগে একটু ঘটনাক্রমে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। ২০১৬ সালে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। মোট ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী সেই পরীক্ষায় বসে। ২০১৮ সাল থেকে নিয়োগ হতে শুরু করে ২৬০০০ শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী। '২০১৮ সাল থেকে' শব্দবন্ধ এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সব নিয়োগ একসঙ্গে ২০১৮ সালেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সেখানে তারপর প্রায় তিন বছর ধরে বিভিন্নভাবে ঘুরপথে অসৎ উপায় অবলম্বন করে চাকরি বিক্রি করতে থাকে তৃণমূল। প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে খোদ মন্ত্রিসভার সম্মতি নিয়ে সুপারনিউমেরিক পোস্ট বা অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয় বেআইনিভাবে। নিয়োগ হয় সেখানেও। যথারীতি মামলা হয় হাইকোর্টে। মামলা ওঠে বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলীর সিঙ্গেল বেঞ্চে। এখানে বলে রাখা দরকার তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলী জজ হবার আগে স্কুল সার্ভিস কমিশনের হয়ে আদালতে ওকালতি করেছেন দীর্ঘদিন। ফলে সেই সময়ের বাকি বিচারকদের থেকে তিনি এই বিষয়ে অনেক বেশি অবহিত ছিলেন। তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলী বিস্তারিত শুনানির পর রায় দেন আট হাজার চাকরি বাতিলের। বলার অপেক্ষা রাখে না যে নিজেদের দুর্নীতির

ফসল কিছু অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে বাঁচাতে এরপর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। শুনানির পর ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলটাই বাতিল করে দেয়। মামলা এরপর যায় সুপ্রিম কোর্টে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চে শুরু হয় শুনানি। এত ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর ভাগ্য এই মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে বিচারপতি চন্দ্রচূড় এবং তার সাথীরা প্রথমে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ (রায় নয়, শুধু সাময়িক স্থগিতাদেশ) দেন। পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় অবসর নিলে পরের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং তাঁর সাথীরা স্থগিতাদেশ বজায় রেখেই এই মামলা শুনতে থাকেন। বিস্তারিত শোনার পর তিনি কিঞ্চিত পরিবর্তন করে হাইকোর্টের রায়কেই বজায় রাখেন। অর্থাৎ প্যানেল ক্যানসেল এবং চাকরিহারা ২৬০০০ শিক্ষক শিক্ষাকর্মী।

রায় দান করতে গিয়ে বিচারপতিরা জানান তাঁরা বারবার রাজ্য সরকারের কাছে যোগ্য এবং অযোগ্যদের তালিকা চেয়েছেন। কিন্তু সরকার তা দেয়নি। সরকারকে পরীক্ষার্থীদের ওএমআর চাওয়া হলে জানা যায় সকল ওএমআর কপি পুড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য। এমনকি কম্পিউটারে কোনো সফট কপিও রাখেনি। যোগ্য অযোগ্যদের সংখ্যা জানতে চাওয়া হলে তিনবারে এই সরকার তিন রকম তথ্য দিয়েছে আদালতের কাছে। শুধু তাই নয়, যোগ্যদের তালিকাতেও যে অযোগ্য কেউ নেই সে কথা রাজ্য হলফ করে বলতে পারেনি। এরমধ্যেই এমন অনেক ওএমআর কপি সামনে আসতে শুরু করে যেগুলি একেবারে ফাঁকা এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ৪২-৪৩ পেয়ে চাকরি করছেন বহাল তবিয়তে। হাইকোর্ট এই পরীক্ষায় র‍্যাংক জাম্প, ফাঁকা খাতায় নাম্বার পাওয়া, সুপার নিউমেরিক পোস্ট বা ইন্টারভিউয়ের নাম্বার বদল সহ মোট ১৭ দফা দুর্নীতি চিহ্নিত করেছিল। তাই প্যানেল বাতিল।

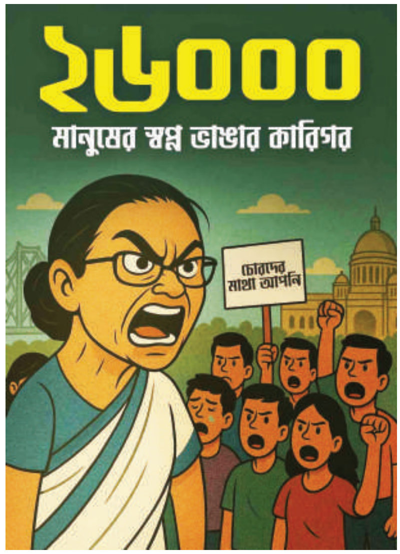

অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন এই হার মমতা ব্যানার্জি সরকারের হার। আপাত দৃষ্টিতে তাই। একটু গভীরে ভাবতে গেলে দেখা যায় আদতে দু'ধরনের মানুষ অনেক কিছু হারিয়েছেন এখানে। প্রথমে অবশ্যই যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা। এদের সংখ্যা সঠিক কত এবং তারা ঠিক কারা? শুধু এই তালিকা রাজ্য সরকার দিয়ে দিলেই এতগুলো মানুষের জীবন জীবিকা বেঁচে যেত। সুপ্রিম

কোর্ট মোট ২১ দিনের শুনানিতে প্রতিদিন এই তালিকা চাইলেও রাজ্য তা দেয়নি। আসলে রাজ্য বারবার চেয়েছে যোগ্য-অযোগ্য গুলিয়ে দিতে যাতে করে হয় সবার চাকরি যায় নয় সবার চাকরি থেকে যায়। মমতা ব্যানার্জি জানতেন যদি ৮-১০-১২ হাজার অযোগ্য পরীক্ষার্থীর নাম সামনে চলে আসে তাহলে তার দলের নেতা-মন্ত্রীরা অনেকেই ওই পরীক্ষার্থীদের চাপে খুব সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হবেন এবং পরিস্থিতির চাপে সামনে চলে আসবে এই দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ড। এমনিতেই এই মামলায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী, এসএসসি চেয়ারম্যান, পর্ষদ চেয়ারম্যান সবাই জেলে ঢুকেছে। এরপর দলের অধিকাংশ নেতা মন্ত্রী সমেত ওনার স্থির করে যাওয়া উত্তরসূরীও যদি জেলে যায় তবে তার সাজানো সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে মুহূর্তে। অন্যদিকে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষা কর্মী ছাড়াও সর্বস্ব হারিয়েছেন অনেক যোগ্য পরীক্ষার্থী। সৎভাবে নিয়োগ হলে এদের অনেকেই আজ চাকরি করতে পারতেন। চাকরিরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সাথে এই পরীক্ষার্থীরাও সমভাবে যোগ্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে মমতা ব্যানার্জি অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষা কর্মীদের পাশে সরাসরি দাঁড়ালেও এই যোগ্য পরীক্ষার্থীদের পাশে একবারও দাঁড়ান নি। ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় অবশ্যই থাকবে একটা গোটা প্রজন্মের বাঙালি যুবক-যুবতীরা যারা শিক্ষক হবার স্বপ্ন দেখলেও সরকারের ইচ্ছায় নিয়োগটাই হয়েছে খুব কম। আর যেটুকু হয়েছে তার অধিকাংশটাও দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ।

নিজেরাই আদালত আবার নতুন করে নিয়োগ করার কথা বলেছে। সরকার মুখে যতই বলুক দুমাসের মধ্যে নিয়োগ করবে, সে সম্ভাবনা আপাতত অথৈ জলে। তার একটা কারণ যদি অযোগ্যদের রক্ষা করা হয় তবে দ্বিতীয় কারণ আদালতে চলা ওবিসি মামলা। অনেকেই জ্ঞাত আছেন ওবিসির নামে হিন্দুদের অধিকার হরণ করে মমতা ব্যানার্জি মুসলিমদের পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করেছেন শেষ ১৪ বছর ধরে। আদালতে সাম্প্রতিক রায় সে গুড়ে বালি ফেলেছে। ফলে আদালত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনরকম স্থগিতাদেশ না দিলেও তোষণের রাজনীতি বজায় রেখে সব নিয়োগ বন্ধ রেখেছে সরকার। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবনা খুব কম।

তাই মমতা ব্যানার্জির নোংরা রাজনীতির বলি হয়ে বেশ কিছু যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত আপাত স্বস্তি পেলেও ভবিষ্যৎ তাঁদের অতল অন্ধকারে।

বাঙালির রাম - রামের বাংলা

সৌভিক দত্ত

রাম নিয়ে মমতাহীনতার কারণ কী? হিন্দু-বাঙালি যাতে রামের কাছে, নিজেদের জাতীয় নায়কের কাছে, ভারত-আত্মার কাছে আবার ফিরতে না পারে? হিন্দু বাঙালিকে হীনবল করার লক্ষ্যেই কি এত আয়োজন?

নব দূর্বাদল-শ্যাম জপ মন নাম শ্রীরঘুপতি রাম।
সুরাসুর কিন্নর যোগী মুনি ঋষি নর,
চরাচর যে নাম জপে অবিরাম॥

সজল-জলদ-নীল নব-ঘন-কান্তি
নয়নে করুণা, আননে প্রশান্তি
নাম শরণে টুটে শোক-তাপ-শ্রান্তি
রূপ নেহারি মূরছিত কোটি কাম॥

ভারত-আত্মা শ্রী রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে এ সংগীতটি একসময় রচনা করেছিলেন বাঙালির বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা তথা ভারতের জাতীয় নায়ককে এই ভাবেই নিজের অসামান্য প্রতিভা দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন তিনি। আজ যখন চারিদিকে কায়েমী স্বার্থে, বাঙালিকে তার নিজের শিকড়চ্যুত করার স্বার্থে হিন্দুর জাতীয় নায়ক শ্রীরামকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে কিছু বিজাতীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠী, তখন জন্মসূত্রে মুসলিম এক কবির বাংলা ভাষায় শ্রীরাম কে নিয়ে লেখা গান সেই রাজনৈতিক অপশক্তিদেরই আসল স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়।

রামের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ বহু প্রাচীন। আনুমানিক ১৪০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তার আগেও দীর্ঘকাল সংস্কৃত ভাষায় পন্ডিতদের মাঝে চলত রামায়ণ চর্চা। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও নিশ্চয়ই লোকগাঁথা বা গানের আকারে রামায়ণ চর্চা চলত, না হলে হঠাৎ করেই একটি সংস্কৃত কাব্যের এমন কিংবদন্তি তুল্য জনপ্রিয়তা পাওয়ার কথা নয়। আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যাকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলে মনে করেন সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরও রাম ভক্তি পরায়ণতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার সমস্ত জীবন জুড়ে। যেমন, দক্ষিণাপথে চলার সময় মহাপ্রভু যে সংকীর্তন করেছিলেন সেটি হল, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ – রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।

আবার মুসলিম শাসনের পরাধীনতার জীর্ণ বিদীর্ণ বাংলায় দ্বিতীয় নবজাগরণ আনা বৈষ্ণব আন্দোলনের মহামন্ত্রই হলো "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।" চৈতন্যদেবের আমলেও রামচন্দ্রের পূজোর নজির পাওয়া যায় তৎকালীন বাংলায়। কালনার গৌরী দাস পন্ডিতের শ্রীপাটে, শান্তিপুরের বড় গোস্বামী ও মধ্যম গোস্বামীর সুত্রাগড় অঞ্চলের বাড়িতে, হাওড়া রামরাজাতলায়, পাঁশকুড়ার রাজবাড়িতে ও শ্রীরামপুরে যে রাম পূজো হতো তার লিখিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি এমন কত পুজো যে হত তা হয়তো স্বয়ং মহাকালই একমাত্র জানেন।

এছাড়াও এখনো বাংলায় দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে রাম পুজোর যে নিদর্শনগুলো পাওয়া যায় সেগুলো প্রমাণ দেয় যে ভারতের আত্মা শ্রী রামচন্দ্র বাঙালির ঠিক কতটা আপন ছিলেন। গবেষক স্বপন কুমার ঠাকুর দেখিয়েছেন, এক কাটোয়াতেই প্রায় কুড়িটির মত রামের মূর্তিআছে। বাঁকুড়া জেলাতেও রাম মন্দির পাওয়া যায়। বাংলায় রঘুনাথশিলা রূপে পূজো করা হত শ্রীরামচন্দ্রের। রাঢ় বাংলার অন্যতম দেবতা হলেন ধর্মরাজ। এই ধর্মরাজপালায় বহু জায়গায় রামায়ণের গান হয়। এছাড়াও বাংলায় প্রচুর পরিমাণে টেম্পল কয়েন পাওয়া গেছে রামচন্দ্রকেন্দ্রিক।

পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতকের এইসব মুদ্রা রাঢ় বাংলার মাটির তলা থেকেই পাওয়া গেছে। আবার বাংলাদেশের রাজশাহীর নরেন্দ্র মিউজিয়ামে রাখা সম্ভবত ১১-১২ শতকের বেলে পাথরের হনুমান মূর্তি বঙ্গদেশের বজরংবলীর আরাধনার পাথুরে প্রমাণ হাজির করে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রাণী রাসমণি, মুরারি গুপ্ত, চৈতন্য জীবনী লেখক দয়ানন্দ সহ ইতিহাসের পরিচিত বাঙালি মুখই রামভক্ত ছিলেন। সুকুমার সেন দেখাচ্ছেন যে, বিষ্ণুমন্ত্র জনপ্রিয় হওয়ার আগে অনেকেই রাম মন্ত্রে দীক্ষা নিতেন, রাণী রাসমণি রঘুবীরের রথযাত্রাও করতেন। বাংলা ভাষায় একটি অত্যন্ত প্রচলিত উপসর্গ হলো রাম, যা কিনা আকারে বড় বোঝায়। সেটাও এসেছে দশরথের বড় ছেলে শ্রীরামের থেকে। বাঙালি শিশুকে যতই মগজ ধোলাই করা হোক রংধনু বলার জন্য, আজও তারা রামধনুই বলে। পাল রাজা

রামপাল থেকে রাজা রামমোহন রায় হয়ে, সাধক রামপ্রসাদ বা আধুনিক বাঙালিকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করা রামকৃষ্ণদেব কিংবা বীর বালক ক্ষুদিরাম বোস - আবাহনকাল ধরে বাঙালি বাবা মায়েরা তার সন্তানের নাম রেখে আসছে জাতীয় বীর রামের নামেই। বাঙালি এখনো কোনো অবস্থায় অপ্রস্তুত হয়ে গেলে বলে "এ রাম", ছোট বাচ্চাকে সাহস দেওয়ার জন্য তাকে শেখানো হয় "ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম লক্ষণ সাথে আছে, করবি আমার কী?" বাংলার মায়েরা জানেন জাতির নায়ক রামের নাম মুখে আনা মাত্রই তার সন্তানের বুক সাহসে ভরে যাবে।

অন্যদিকে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিবারের উপাস্য দেবতা ছিলেন শ্রীরাম। রামকৃষ্ণদেব ও তার দুই দাদার নাম রাখা হয়েছিল রামের নামে - রামকুমার, রামেশ্বর আর রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণদেবের বাবা ছিলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। আবার ক্ষুদিরামের বাবা ছিলেন মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়। ফলে দেখা যাচ্ছে যে তাদের পরিবারের সব পুরুষ সদস্যের নামে রাম যুক্ত থাকত। রানী রাসমনির পরিবারের কূল দেবতাও ছিলেন রঘুবীর অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র। আবার রামরাজাতলা, রামপুরহাট এই জায়গাগুলোর নামই বলে দেয়, বাংলার সঙ্গে রাম নাম কতটা সম্পৃক্ত। রামরাজাতলায় তো প্রায় ৩০০ বছর আগে সেখানকার জমিদার অযোধ্যারাম চৌধুরী স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন রামচন্দ্রের পুজো করার। বিশালাকার রামসীতার মূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু করেন। পুজোর শেষে বিশেষ শোভাযাত্রাও বের করতেন তিনি। সেই রাম পুজোর ঐতিহ্য আজও হাওড়ার এক বিশেষ উৎসব। বলা হয় যে বাংলার সবথেকে দীর্ঘ রামনবমীর শোভাযাত্রা নাকি হয় এই রামরাজাতলাতেই।

আর রামচরিতম্ এর কথা তো বলাই হল না। ১১০০ শতকে বাংলার পাল সাম্রাজ্যের শাসক রাম পাল এর সভাকবি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। রামের সীতা উদ্ধারের সঙ্গে রামপালের বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারকে তুলনা করে রামচরিতম নামে একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য রচনা করেন তিনি। যে জাতির ইতিহাসে প্রায় হাজার বছর আগে শাসকের নাম পাওয়া যাচ্ছে রামের নামে সেই জাতির কাছে রাম নাকি বহিরাগত বলে প্রচার করছে কিছু স্বার্থান্বেষী। হয় এরা নির্বোধ আর নয়তো সব জেনেশুনে বাঙালি কে শিকড়হীন করার মিশনে নেমেছে অন্য কোন বিজাতীয় শক্তির দালালি করে।

আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাও বাদ চলে গেল। তাঁর জীবনের রামের প্রভাব ও শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে তার কাজ নিয়ে লিখতে গেলে তো আস্ত আলাদা একটা আর্টিকেল লিখে ফেলতে হয়। তাঁর নিজের সবচাইতে বেশি দাগানো বই যা তিনি পড়েছিলেন এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে আজও সংরক্ষিত আছে, তা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত (১৩৪৩) 'কৃত্তিবাস রামায়ণ'। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাংলার নিজস্ব সম্পদ। তার অটোবায়োগ্রাফি গুলোতে দেখা যায় ছোটবেলায় ভৃত্যদের কিংবা জোড়াসাঁকোয় গান শোনাতে আসা পাঁচালী গায়ক কিশোরী চাটুজ্জের কাছে তার রামায়ণ শোনার কাহিনী। তার লেখা বিভিন্ন কাব্য- গল্প বা উপন্যাসে উঠে এসেছে রামায়ণের কথা। বিশেষত দু'টি গীতিনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া', অহল্যার প্রতি', 'পতিতা' ইত্যাদি তো সরাসরি রামায়ণের কাহিনী থেকে তুলে আনা কিংবা অনুসরণ করা। 'পুরস্কার' বা 'চিত্রা' কাব্যের 'নগর সঙ্গীত' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথকে রামায়ণ নিয়ে আসতে দেখি। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ ও 'সহজপাঠ'- এর কথা তো বলাই বাহুল্য।

আর বাঙালির এই আবাহন কালের ঘরের ছেলে রামকেই কিনা রাজনৈতিক স্বার্থে বাতিল করে দিতে চলেছিল কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী। রামনবমী ঘোষিত হয়েছিল অবাঙালিদের অনুষ্ঠান হিসাবে। অথচ ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত কলকাতায় রামনবমীর ছুটি থাকতো। তারপর কংগ্রেসের আমলে কোন উদ্দেশ্যে সেটা বাদ দেওয়া হয়েছিল সেটা রাজনীতি নিয়ে উৎসাহী পাঠক মাত্রই বুঝবেন।

রামনবমী শোভাযাত্রা নিয়ে বাঙালিকে কম কুৎসা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। এমনকি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জীবনহানির উদ্দেশ্যে শারীরিক আক্রমণ পর্যন্ত করা হয়েছে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া ভক্তদের উপরে। এবং সেটা কেন? শুধুমাত্র বাঙালি যাতে রামের কাছে, নিজেদের জাতীয় নায়কের কাছে, ভারত-আত্মার কাছে আবার ফিরতে না পারে, সেই জন্য? কারণ তারা জানে যে রাম নামেই লুকিয়ে আছে বাঙালির ক্ষাত্রতেজ, ক্ষাত্রবীর্য। সেজন্যই হিন্দু বাঙালিকে হীনবল করার লক্ষ্যে এত আয়োজন, যাতে বাংলার দুই তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড '৪৭ সালে একবার দখল করার পরে পশ্চিমবঙ্গ নামের বাকি হোমল্যান্ডটুকুও এবার দখল করে নেয়া যায়।

কিন্তু আশার কথা হল বাঙালি জাগছে, বাঙালি আবার ফিরছে ক্ষত্রিয়কূলতিলক রামের কাছে, মেকি অহিংসা ও বিজাতীয় রাজনীতির আইডেন্টিটি ভুলিয়ে দেওয়া অপচেষ্টাকে পরাজিত করে বাঙালি আবার জাগছে রাম নামের ক্ষাত্রতেজে। এবারের রামনবমীতে প্রায় কোটি লোকের সমাগম সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। আর যেদিন প্রত্যেকটি বাঙালি আবার ফিরে আসবে তার অতি পরিচিত রামের কাছে, সেই দিনই নিশ্চিত হবে বাঙালির এক ও একমাত্র হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ।

[ঋণ স্বীকার - এটি একটি তথ্যমূলক রচনা এবং তথ্য স্বাভাবিকভাবেই মৌলিক হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন লেখা থেকে আমাকে সাহায্য নিতে হয়েছে। তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।]

ছবিতে খবর

ধুলিয়ান পুরসভা এবং বেতবোনা গ্রামে জিহাদিদের অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে মালদহের পারলালপুরে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু পরিবারের ১১ জনকে নিয়ে ভবানী ভবনে রাজ্য পুলিশের ডিজির দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

মোথাবাড়িতে তৃণমূল সমর্থিত জেহাদি শক্তির অমানবিক আক্রমণে আক্রান্ত হিন্দুদের সাথে সাক্ষাৎ করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

তৃণমূল সমর্থিত জেহাদি শক্তির অমানবিক আক্রমণে বাস্তুহারা মুর্শিদাবাদের হিন্দু শরণার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জেলায় জেলায় মাল্যদান সহ বাবাসাহেবের আদর্শ প্রচার অনুষ্ঠানে জেলা সহ রাজ্য নেতৃত্ববৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ।

মুরলীধর সেন লেন বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে ডঃ আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের হিন্দু শহীদ দিবস পালন।

মালদার মোথাবাড়িতে চৌরঙ্গী, পাল পাড়া, হালদার পাড়া সহ অন্যান্য এলাকায় জেহাদিদের হাতে আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও এলাকা পরিদর্শনে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শুভ বাংলা নববর্ষ (১৪৩২)-এর সূচনায় অমঙ্গল ঘটের বিসর্জনে, মঙ্গলের আগমনে মঙ্গল শোভাযাত্রা।

ছবিতে খবর

বিজেপির ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষে কলকাতায় ৬ মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ববৃন্দ।

ভোটার লিস্ট থেকে অন্যায়ভাবে হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার তৃণমূলী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ডাকে নির্বাচনী আধিকারিক কার্যালয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

পবিত্র রাম নবমী উপলক্ষ্যে জেলায় জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

চাকরি চুরির প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দের উপস্থিতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায়।

বঙ্গাব্দের প্রণেতা

বাংলার প্রথম সার্বভৌম সম্রাট শশাঙ্ক

অধ্যাপক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেশ চন্দ্র মজুমদারের পাশাপাশি অক্ষয়কুমার মিত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, মণিগোপাল মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শশাঙ্ককে বাংলার জাতীয় নায়কের মর্যাদা দিয়েছেন। অথচ আমরা শশাঙ্কের সম্পর্কে যা তথ্য পাই তা শুধু তাঁর শত্রুপক্ষের কাছ থেকেই। স্বাভাবিকভাবেই সেই তথ্য সত্যের অপলাপ, নায়কের আসনে প্রতিষ্ঠা করেনি শশাঙ্ককে। রমেশ চন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন শশাঙ্ক যদি হর্ষবর্ধনের ন্যায় "Friendly Biographer" পেতেন তাহলে তাঁকেও হর্ষের মতোই উজ্জ্বল মনে হত।

পটভূমি: প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগে বাংলা বলে নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের কথা জানা যায় না। পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, রাঢ় প্রভৃতি নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিচিত ছিল। গৌড় ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মানুষ বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় গৌড়ের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও পশ্চিম বর্দ্ধমান নিয়ে গৌড় গঠিত ছিল। এ হেন গৌড় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে শশাঙ্কের হাত ধরে খ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে।

গৌড়ের পূর্ব ইতিহাস: শশাঙ্কের সমকালীন গৌড় আলোচনার আগে এর পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে দু-চার কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ৫৪৪ খ্রী: ৫ নং দামোদরপুর লেখ-র সাক্ষ্য জানুয়ারী পুণ্ড্রবর্ধন পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের অধীনে ছিল। যাই হোক, পুনরায় শশাঙ্কের কথায় ফিরে আসা যাক। তাঁর প্রথম জীবনে কীভাবে ও কী পরিস্থিতিতে তিনি গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন সে সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। বিহারের সাসারাম জেলার রোহতাসগড় গিরিদুর্গের প্রাচীরে উৎকীর্ণ একটি সীলমোহরের ছাপে 'শ্রী মহাসামন্ত শশাঙ্ক' কথাটি পাওয়া গেছে। এই শশাঙ্ক যদি গৌড়রাজ শশাঙ্কের সঙ্গে অভিন্ন হন তাহলে বলা যায় যে শশাঙ্ক একজন সামন্ত ছিলেন তাঁর প্রথম জীবনে। তিনি কার মহাসামন্ত ছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা না গেলেও ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ মনে করেন যে পরবর্তী গুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্ত ছিলেন তাঁর অধিরাজ।

শশাঙ্কের প্রথম জীবন: শশাঙ্কের নেতৃত্বাধীন গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য লাভের ইতিহাস সম্বন্ধে জানার জন্য আমাদের সম্বল হল সমসাময়িক লেখমালা, হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টর 'হর্ষচরিত', সোয়ান সাং -এর 'সি-যু-কি' এবং অষ্টম শতকের বৌদ্ধ গ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'। উপরিউক্ত ঐতিহাসিক উপাদানগুলির সহায়তায় রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর 'History of Bengal' (VOL. I), নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' এবং দীনেশ চন্দ্র সরকার তাঁর 'পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত' গ্রন্থে শশাঙ্কের ইতিহাসকে পুণর্গঠন করার প্রচেষ্টা করেছেন।

মহারাজ শশাঙ্কের আমলের স্বর্ণ মুদ্রার একপিঠে রয়েছে নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্তি, অন্যপৃষ্ঠে দেখা যায় পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্তি।

কনৌজ-গৌড়-থানেশ্বর-মালব: ৬০৬ খ্রী: এর কিছু পূর্বে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হন ও কর্ণসুবর্ণে নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রমেশ চন্দ্র মজুমদার -এর মতে, শশাঙ্কের বিদেশনীতির মূল লক্ষ্য ছিল মৌখরীরাজের হাত থেকে নিজ রাজ্যকে রক্ষা করা। সম্ভবত মগধ ও গৌড়ের অধিকারকে কেন্দ্র করে পরবর্তী গুপ্ত ও মৌখরীদের মধ্যে কয়েক পুরুষ ধরে একটি তিক্ত সংগ্রাম চলে আসছিল। মৌখরীরা থানেশ্বরের পুষ্যভূতি শাসকদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। মৌখরী রাজ অবন্তীবর্মনের পুত্র গ্রহবর্মন থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্মনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। এর ফলে মৌখরীরা পরবর্তী গুপ্তদের আক্রমণের ভয় থেকেও মুক্ত হন। কারণ মহাসেনগুপ্ত সম্ভবত ছিলেন প্রভাকরবর্ধনের মাতুল। কিন্তু এরপর মহাসেনগুপ্তকে হত্যা করে দেবগুপ্ত মালবের সিংহাসন দখল করলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে তাঁর আধিপত্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তার করেছিলেন। বৃদ্ধ প্রভাকরবর্ধনের অসুস্থতা ও মৃত্যুর সুযোগে মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরীরাজ গ্রহবর্মাকে আক্রমণ ও হত্যা করে রাণী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে কারারুদ্ধ করেন। 'হর্ষচরিত' পাঠে মনে হয়, প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যু এবং শেষোক্ত দুইটি ঘটনা একইদিনে সংঘঠিত হয়েছিল। দেবগুপ্ত তারপর যখন থানেশ্বরের দিকে অগ্রসরমান শশাঙ্ক তখন দেবগুপ্তের সহায়তার জন্য কনৌজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন শশাঙ্কের দেবগুপ্তের সঙ্গে কোন চুক্তি ছিল না। দু'জনে আলাদাভাবে মৌখরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যাইহোক শশাঙ্ক সসৈন্যে দেবগুপ্তের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বেই সদ্য সিংহাসনে আসীন রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে দেবগুপ্তের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে আক্রমণ, পরাভূত ও নিহত করেন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ও হর্ষবর্ধনের সিংহাসনারোহণ: রাজ্যবর্ধন কনৌজ দখল বা রাজশ্রীকে উদ্ধারের পূর্বেই তিনি শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হন। বাণভট্ট ও সোয়ান সাং-এর মতে, শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। অন্যদিকে হর্ষবর্ধনের লেখর সাক্ষ্য অনুযায়ী রাজ্যবর্ধন সত্যানুরোধে শত্রুশিবিরে গেছিলেন এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজসিংহানে অভিষিক্ত হয়েই সসৈন্যে গৌড়ের শশাঙ্কের রিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মন দূত পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। এরপর

হর্ষবর্ধন তাঁর ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন।

শশাঙ্ক-হর্ষবর্ধন সংঘর্ষ: বাণভট্টের বিবরণে জানা যায় যে, হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মনের মিলিত বাহিনী শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু এরপর শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ হয়েছিল কী না সে ব্যাপারে বাণভট্ট ও সোয়ান সাং উভয়েই আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের সংঘর্ষের একমাত্র বিবরণ পাওয়া যায় আর্যমঞ্জশ্রীমূলকল্পে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা লিখিত এই গ্রন্থে রাজাদের নাম নেওয়া হয়েছে খুবই অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়—হয় এখানে রাজার নামের প্রথম অক্ষর বলা হয়েছে, নাহলে তাঁর নামের সমার্থক কোন প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে যে 'সোম' রাজার কথা বলা হয়েছে তাঁকে শশাঙ্ক বলেই মনে করেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার, কারণ উভয়েই চন্দ্রের প্রতিশব্দ। আর এখানে তাঁর যে শত্রুর কথা বলা হচ্ছে যার নাম 'হ' দিয়ে শুরু, তিনি নিঃসন্দেহে হর্ষবর্ধন। যাই হোক, এই গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী রাজা হ এই সোমরাজাকে পুণ্ড্রবর্ধনে পরাজিত করে তাঁকে নিজ রাজ্যসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছিলেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের এই বিবরণ কতটুকু সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ হর্ষবর্ধনের পক্ষের দুই লেখক বাণভট্ট ও সোয়ান সাং এ ব্যাপারে নীরব। তবে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ করেও থাকেন তবে তাঁর এই জয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তা একপ্রকার নিশ্চিত।

শশাঙ্কের রাজ্যসীমা: কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন ও হর্ষবর্ধনের মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক যে সমগ্র গৌড় দেশ, মগধ, বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং উৎকল, কম্বোজ দেশের অধিপতি ছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। কম্বোজের শৈলোদ্ভব বংশীয় মহারাজ মহাসামন্ত দ্বিতীয় মাধবরাজের ৬১৯ খ্রী: এর একটি লেখতে তিনি শশাঙ্ককে নিজের অধিরাজ বলে উল্লেখ করেছিলেন। সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তির মেদিনীপুর লেখ দুটিতে শশাঙ্ককে তাঁদের অধিরাজ বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই লেখ দুইটির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় দণ্ডভুক্তি শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উৎকল দণ্ডভুক্তি বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ওড়িশার দু-একজন শাসকও তাঁদের লেখতে শাসক হিসেবে শশাঙ্কের উল্লেখ করেছেন। রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন শশাঙ্কের রাজ্যসীমা গঞ্জাম (দক্ষিণ উড়িষ্যা) ও চিল্কা লেক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যু: ৬৩৭ খ্রী:-এর কিছু পূর্বে সম্ভবত শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছিল। কারণ ৬৩৭-৩৮ খ্রী: মধ্যে মগধে ভ্রমণের সময় সোয়ান সাং শোনেন যে কিছুদিন আগেই শশাঙ্ক নাকি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেছেন এবং স্থানীয় বুদ্ধমূর্তিটি নিকটেই একটি মন্দিরে সরিয়ে রেখেছেন। এই পাপের ফলেই নাকি শশাঙ্ক কুষ্ঠ জাতীয় কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অল্পদিনের মধ্যে মারা যান। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'-তেও এই গল্পের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে, এই গাঁজাখুরি গল্পটি খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী ছিলেন কিনা?: বিভিন্ন বৌদ্ধ লেখক শশাঙ্ককে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী বলে উল্লেখ করেছেন। সোয়ান সাং বৌদ্ধধর্ম পালনকারী ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শশাঙ্কের বিভিন্ন অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পেও শশাঙ্কের বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতার কথা আছে। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তবে তিনি সত্যই বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। সোয়ান সাং ও মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে শশাঙ্কের বর্ণনা যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে করা হয়েছে-তা কখনই বলা যায় না। রমেশ চন্দ্র মজুমদার

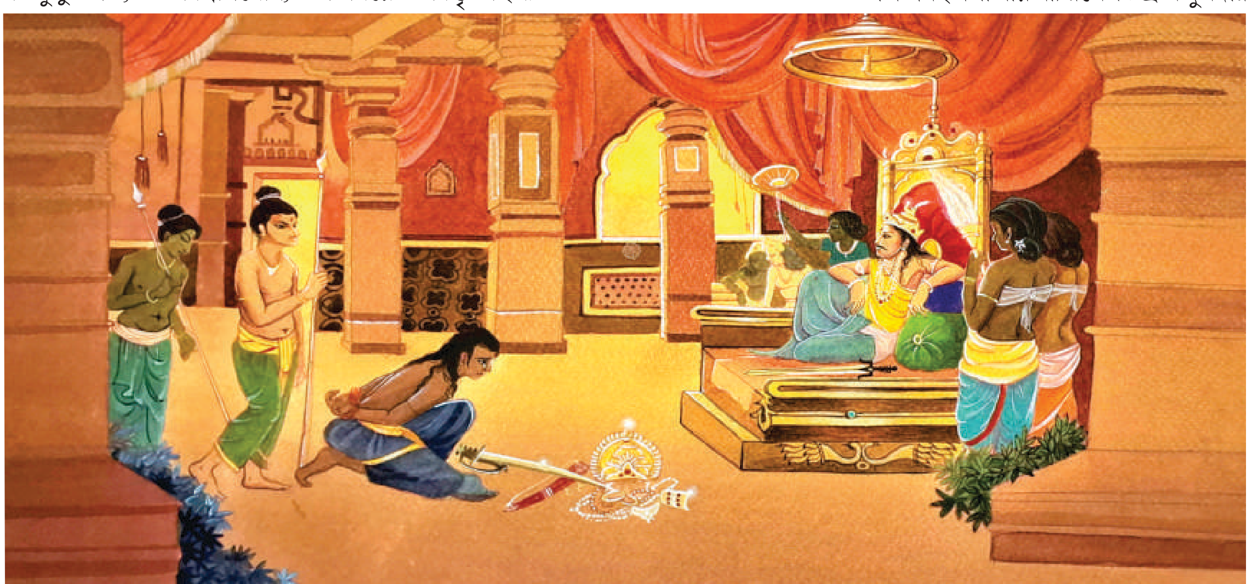

মহারাজ শশাঙ্কের সম্মুখে পরাজিত কামরূপ রাজ।

বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রাজা - শশাঙ্ক।

অবশ্য শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন একথা মানতে রাজী নন। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, শশাঙ্ক যে বৌদ্ধধর্মের খুব একটা অনিষ্ট করতে পারেননি তা সত্য। নাহলে শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সোয়ান সাং ও ৫০ বছর পরে ইৎ সিং বাংলায় এসে বৌদ্ধধর্মের এতটা সমৃদ্ধি দেখতে পেতেন না। দীনেশ চন্দ্র সরকারও শশাঙ্ককে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী হিসাবে স্বীকার করেন নি। এর পিছনে কারণ হিসেবে দীনেশ চন্দ্র সরকার শশাঙ্কর রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উপান্তে রক্তমৃত্তিকা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহারের উপস্থিতির কথা বলেছেন। তাছাড়া লামা তারানাথের গ্রন্থেও বৌদ্ধ বিদ্বেষীদের প্রসঙ্গে শশাঙ্কের কথা নেই।

শশাঙ্কের সাম্রাজ্য: দীনেশ চন্দ্র সরকার তাঁর 'পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "বাংলার ইতিহাসের দু-জন মাত্র নরপতি সর্বভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ সম্মানের পাত্র হয়েছিলেন। তাঁদের একজন শশাঙ্ক এবং দ্বিতীয় জন ধর্মপাল"। তিনি আরো লিখেছেন যে, শশাঙ্কের সময় পূর্বে বাংলাদেশের ঢাকা- কুমিল্লা অঞ্চলের বঙ্গ ও সমতট থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মৌখরীরাজ্যের রাজধানী কান্যকুব্জ পর্যন্ত তাঁর অধিকার প্রসারিত হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁকে উত্তরপ্রদেশ থেকে সরে আসতে হয়েছিল।

মুদ্রা প্রণয়ন ও বঙ্গাব্দের প্রণেতা: গৌড়, বঙ্গ ও সমতট থেকে শশাঙ্কের বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে। যদিও গৌড় ও বঙ্গের মুদ্রার সঙ্গে সমতটের মুদ্রার তৌলমান, মুদ্রার ওপরের ছবি প্রভৃতির পার্থক্য দেখা যায়। দীনেশ চন্দ্র সরকার উল্লেখ করেছেন যে, শশাঙ্কের পর গৌড়দেশে আর কেউ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেননি। বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল ৫৯৪ সালের ২০-এ এপ্রিল- যা শশাঙ্কের সিংহাসনারোহণের সমসাময়িক। তাই বাংলার প্রথম সম্রাট শশাঙ্ককেই একমাত্র যুক্তিযুক্তভাবে বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অভিহিত করা যায়।

উপসংহার: অক্ষয়কুমার মিত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, মণিগোপাল মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শশাঙ্ককে বাংলার জাতীয় নায়কের মর্যাদা দিয়েছেন। রমেশ চন্দ্র মজুমদারও শশাঙ্কের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অবশ্য নীহাররঞ্জন রায় শশাঙ্ককে জাতীয় নায়ক বা বীর বলা যায় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তিনি নিজেই বলেছেন শশাঙ্ক যেভাবে একজন অজ্ঞাতকুলশীল মহাসামন্তরূপে জীবন আরম্ভ করে তদানীন্তন উত্তর ভারতের সর্বোত্তম রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তি (কনৌজ-থানেশ্বর-কামরূপ) বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, শেষপর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, এ তথ্যই ঐতিহাসিকের প্রশংসিত বিস্ময় উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট। বংশ পরম্পরায় চলে আসা কনৌজ-গৌড় সংগ্রাম তাঁরই শৌর্য ও বীর্যে নতুন রূপ লাভ করেছিল। 'সকলোত্তরপথনাথ' হর্ষবর্ধনকে দ্বিতীয় পুলকেশী ছাড়া যদি কেউ সার্থকভাবে প্রতিহত করে থাকেন তবে তিনি শশাঙ্ক। উত্তর ভারতের আধিপত্য নিয়ে পালরাজ ধর্মপাল-দেবপাল প্রমুখের আমলে গৌড় -কনৌজের যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরবর্তীকালের বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করেছে, তার প্রথম সূচনা শশাঙ্কের আমলেই দেখা দিল এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাকে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় বঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করালেন। দুঃখের বিষয় যে আমরা যে ঐতিহাসিক উপাদানগুলি থেকে শশাঙ্কের সম্পর্কে জানতে পারি সেগুলি তাঁর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে। বাণভট্ট একদিকে যেমন তাঁর হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে 'গৌড়াধম', 'গৌড়ভুজঙ্গ', 'গৌড়পাষন্ড' প্রভৃতি বলেছেন, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পেও তেমনি তাঁকে 'চরিত্রহীন', 'নগ্নজাতির রাজা' ইত্যাদি বলা হয়েছে। আর সোয়ান সাং তো ছিলেন শশাঙ্কের সবথেকে বড় সমালোচক। অর্থাৎ দুঃখের বিষয় যে, শশাঙ্কের শত্রুপক্ষের কাছ থেকেই আমরা শুধু তাঁর সম্পর্কে তথ্য পাই। এই কারণেই রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন শশাঙ্ক যদি হর্ষবর্ধনের ন্যায় "Friendly Biographer" পেতেন তাহলে তাঁকেও হর্ষের মতোই উজ্জ্বল মনে হত।

পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে?

পুলক নারায়ণ ধর

পশ্চিমবঙ্গকে কি পশ্চিম বাংলাদেশ তৈরি করার পথে নিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল? প্রশাসন কি ব্যর্থ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায়? শিল্প-স্বাস্থ্য-শিক্ষা সবেতেই গোল্লা পাওয়া তৃণমূল কি পারবে ২০২৬-এর আগে সরকার টিকিয়ে রাখতে? ফিরহাদ-সিদ্দিকুল্লাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করতে কি রাস্তার দখল নিচ্ছে বাংলার হিন্দু সনাতনীরা?

পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। শিল্প-স্বাস্থ্য-শিক্ষা কোনও ক্ষেত্রেই আশার আলো নেই। বক্তৃতা মিথ্যা আশ্বাস ও প্রচার সর্বস্বতা রাজ্যকে গ্রাস করেছে। এক সময় ছিল ইনকিলাব জিন্দাবাদ এর স্লোগান। আজ রাস্তা জুড়ে উন্নয়নের স্লোগান চারিদিকে উন্নয়নের মিথ্যা স্রোতধারা। চারিদিকে শুধু 'নাই নাই'-এর রব। প্রতিটি গৃহ প্রতিটি পরিবার আজ বিপন্ন। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ যুবকরা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে ভিন রাজ্যে খাবারের সন্ধানে চলে গেছে। আছে শুধু অক্ষম বৃদ্ধরা আর আছে ঠগীর দল। যাদের হাড়হিম করা 'হা রে রে' ধ্বনি মাঝে মাঝে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জানান দেয়। আবার ভোটের স্বার্থে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইফতার পার্টির দামামা বাজে। চলছে শক্তি প্রদর্শনের কুচকাওয়াজ।

ইতিমধ্যে হিন্দুত্ব বা হিন্দু ধর্মকে "গন্ধা ধর্ম" আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে আসীন নেত্রী। যাদের সমাবেশে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে সেই মানুষগুলো ভারতবর্ষ বলতে বলে হিন্দু। হিন্দু বলতে বোঝে বিজেপি। বিজেপি বলতে বোঝে ইসলামবিরোধী শক্তি। 'দার উল হারব' এ বসবাস করে তারা দার উল ইসলামের পথ আবিষ্কার করতে চলেছে। এই পরিস্থিতি দেশ বিভাগের প্রাক্কালে বাঙালি ও বঙ্গবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল। এর পরিণতিতে ঘটেছিল নোয়াখালী ও কলকাতার দাঙ্গা। কলকাতা দাঙ্গা "দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং" বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ ও মালদহে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তা এই জেহাদী শক্তিকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াসের ফল।

বাঙালি হিন্দুর মনে এখনো সেই ৪৬-এর দাঙ্গা এবং দেশ ভাগের পরবর্তীতে নানা সময়ে দাঙ্গা দগদগে ঘা এর মতন তাদের হৃদয়ের ভিতর আছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক নিয়মেই বিপরীত বাহুতে বর্তমানে তৈরি হয়েছে প্রতিরোধশক্তি। এই প্রতিরোধ ভবিষ্যৎ আত্মরক্ষার প্রতিরোধ। এই চিন্তার শক্তিতেই জন্ম নিচ্ছে অস্মিতা বা আইডেন্টিটি বোধ। নানা পূজা-পার্বণ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পাচ্ছে। ইদানিং পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র বিপুলভাবে রামনবমী পালনের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা তারই পরিচয়।

শাসকদলের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরতে শুরু করেছে চারিদিকে শুধু শূন্যতা চুরি-চুরির জোয়ারে চাকরি পেয়েও আজ তারা চাকরি-হারা সংখ্যাটা কিন্তু বিপুল। যে ২৬ হাজার ৫০০ জনের চাকরি গেছে বলে জানা যাচ্ছে প্রকৃত সংখ্যাটা কিন্তু আরো অনেক বেশি কারণ যারা চাকরি পায়নি অথচ যোগ্য ছিল তাদের সংখ্যাটা ধরলে এটা দাঁড়ায় প্রায় 22 লক্ষ। এরা কোন অবস্থাতেই তাদের দাবি ছাড়বে না।

শিক্ষামন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী আগডুম বাগডুম বলে নানা কথার জালে সবাইকে ভুলিয়ে দেওয়ার বেঁধে রাখার চেষ্টা করছেন। বৃথা চেষ্টা। শেষ অস্ত্র হচ্ছে সাম্প্রদায়িক জাগরণ অর্থাৎ ওয়াকফ আইন নিয়ে আবার ভুল বুঝিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষকে সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দেওয়া। এদেরকে একজোট করে হিন্দু বিরোধীতা সৃষ্টি করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শাসক দল ব্যর্থ হবেই কারণ আত্মরক্ষার বিপরীত শক্তি আজ আরও জোরালোভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। "খেলা হবে খেলা হচ্ছে" বলে নিজের জালে নিজেই সে আটকে যাচ্ছে। এর ভয়ংকর পরিণতির কথা ভেবে সাধারণ মানুষ খুবই শঙ্কিত।

শান্তিরক্ষার বাহিনী পুলিশ। কিন্তু সে আজ জিহাদিদের হাতে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে এবং পালাচ্ছে। এর প্রতিশোধ নিতে বা জিঘাংসা চরিতার্থ করতে নিরস্ত্র শিক্ষকদের পিটিয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করছে। নিজের অপদার্থতা ঢাকতে মুখ্যমন্ত্রী আজ যে অবিমৃষ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন এর ফল তাকে পেতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এই স্বৈরতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক তুষ্টিকরণের রাজনীতির করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার পেতেই হবে। সুস্থ গণতান্ত্রিক ও সর্বমত সমন্বয়ের পথ সুগম করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই অপশাসনের অবসান ঘটা

অস্তিত্বের শর্ত: সংঘবদ্ধতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা

কৌশিক কর্মকার

নিজ সম্প্রদায়, নিজ গোষ্ঠী, নিজ ধর্মকে রক্ষা করা যে কোন ব্যক্তির পরম কর্তব্য। যদি অপর ধর্ম নিজ ধর্মের মানুষদের অনিষ্ট করে, তাহলে তাদের রক্ষা করা কি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে না? সম্মানীয় পাঠক, আপনার কি মনে হয়? 'সাম্প্রদায়িক' না 'উদ্বাস্তু', কোন বিশেষণটি আপনার পক্ষে সম্মানজনক হবে? কোন শব্দটি আপনার ধর্ম, সমাজ, গোষ্ঠীকে রক্ষা করবে?

১৮৯৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর; শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'হিন্দু, জরথুষ্ট্রীয় ও ইহুদী- এই তিনটি ধর্মই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ধর্মগুলির প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি লুপ্ত না হইয়া এগুলি যে এখনও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইহুদী-ধর্ম তৎপ্রসূত খ্রীষ্টধর্মকে আত্মসাৎ করিতে পারা তো দূরের কথা, নিজেই ওই সর্বজয়ী ধর্ম দ্বারা স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, এবং অতি অল্পসংখ্যক পারসী মাত্র এখন মহান জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; অপরদিকে আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে, মনে হইয়াছে যেন বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গেল; কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া সহস্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ঐ সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে।' হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবী থেকে ক্রমাগত উৎখাত হতে হতে ১৯৪৮ সালে ইহুদিরা তাদের নিজ ভূমি অর্জন করে; জন্ম হয় নবীন রাষ্ট্র ইসরায়েলের। আজ থেকে একশো বত্রিশ বছর আগে স্বামীজি যে অল্প সংখ্যক পারসীর সন্ধান পেয়েছিলেন আজ একুশ শতকে তারা বিলুপ্তপ্রায়। পারসী ভাষা-সংস্কৃতি বিরাট আরবীয় গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। সেই একই সময়ে হিন্দুধর্ম বিষয়ে যে ইতিবাচক ছবি স্বামীজী দেখেছিলেন, ইতোমধ্যে তার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে। যে সময় সারা পৃথিবী থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা তাদের ঘর খুঁজে পেল, সেই একই সময়ে ভারতের পূর্ব প্রান্তের বাংলাভাষী হিন্দুরা তাদের ঘর হারালো। যত দিন গেছে ইহুদিরা তথা তাদের প্রাণপ্রিয় রাষ্ট্র ইসরায়েল তত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; অন্য পক্ষে বাংলাভাষী হিন্দুরা ক্রমশ হয়েছে দুর্বল থেকে দুর্বলতর। আজ তাদের অস্তিত্বই সংকটের মুখে। তো এই দুর্বলতার কারণ কী? স্বামীজী তাঁর ওই বক্তৃতার মধ্যেই এক জায়গায় বলেছেন, 'হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে; কিন্তু লক্ষ্য করিও, তাহারা সর্বাবস্থায় নিজেদের দেহপীড়নই করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না। কোন ধর্মোন্মাদ হিন্দু - চিন্তায় স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেও ধর্মগত অপরাধের প্রতিবিধান করিবার জন্য কখনও অগ্নি প্রজ্বলিত করে না; ইহাকে যদি তাহার দুর্বলতা বলো সে দোষ তাহার ধর্মের নয়, যেমন ডাইনী পোড়ানোর দোষ খ্রীষ্টধর্মের উপর দেওয়া যায় না।' আজ একুশ শতকের তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে খুব

সহজেই অনুধাবন করা যায় অন্যায়ের, অপরাধের প্রতিবিধানের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে না পারাই এই দুর্বলতার একমাত্র কারণ।

স্বামীজীর উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে লক্ষ করা যায়, হিন্দু ধর্ম আদর্শগতভাবে কখনো অন্য ধর্মমতকে হেয় করতে পারে না। জগতে সকল ধর্ম মতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে হিন্দু ধর্মে। এহেন পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতিকে অস্বীকার করে কোন মত যদি মনে করে পৃথিবীতে তারাই একমাত্র অবস্থান করবে, তাদের আদর্শই সকলকে মেনে চলতে হবে, তাহলে খুব জোরের সঙ্গে তাদেরকে তাদের মতের অসারতা বুঝিয়ে দিতে হবে। আর এই বুঝিয়ে দেওয়ার কাজটি সকলের, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নয়। এই কাজটা খুব সফলভাবে করতে পেরেছে স্বামীজি শংসিত প্রাচীন ধর্ম ইহুদীদের রাষ্ট্র ইসরায়েল। সাম্প্রতিক হামাস-ইসরায়েল দ্বন্দ্বের সূচনায় সারা পৃথিবী লক্ষ করেছে কীভাবে প্যালেস্তানিয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামাস এক অমুসলিম তরুণীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে রাজপথে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে হত্যা করেছিল; কীভাবে একটি মিলন অনুষ্ঠানে অসংখ্য অমুসলিম মানুষকে অকস্মাৎ হত্যা করেছিল ইসলামিক সন্ত্রাসী হামাস গোষ্ঠী! আজ ইসরায়েল পেরেছে হামাসকে তার প্রাপ্য পাওনা চুকিয়ে দিতে। আমরা তা পারিনি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইহুদিদের ঘরে ফেরার কাল ছিল বাংলাভাষী হিন্দুদের ঘর ছাড়ার কাল। তারপর থেকে পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশে নাগাড়ে হিন্দু নিকেশ চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল বরকত তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন ১৯৬৪ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মোট ৮১ লক্ষ হিন্দু 'নিরুদ্দিষ্ট' হয়েছে; বলা বাহুল্য দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। ৬০ লক্ষ হিন্দু হারিয়েছে তাঁদের ২৬ লক্ষ একর ভূসম্পত্তি যার আর্থিক মূল্যমান ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা কিনা বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৭৫ ভাগের

তৃণমূল সমর্থিত জেহাদি শক্তির আক্রমণে মুর্শিদাবাদে বাস্তুহারা হিন্দু শরণার্থীদের ঠাঁই মালদার পারালাল হাই স্কুল।

সমপরিমাণ (২০০৭ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে)। গত ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পর এমন একটি দিন যায়নি, যেদিন ওপার বাংলায় হিন্দু নির্যাতন হয়নি। সেই একই সংক্রামক ব্যাধিতে আজ পশ্চিমবঙ্গ আক্রান্ত। এই সময় দাঁড়িয়ে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই ব্যাধিটিকে সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা; কোন তত্ত্ব, দর্শন দিয়ে ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদ রূপ এই ব্যাধিকে আড়াল করা যাবে না। যারা হিন্দু-মুসলিম বনাম মানুষ, জাত বনাম ভাত ইত্যাদি তত্ত্ব সাজিয়ে এই ব্যাধিকে সর্বদা আড়াল করার চেষ্টা করে, খুব স্পষ্টভাবে বলা যায় তারা এই সাম্রাজ্যবাদী চেতনার পরোক্ষ সৈনিক।

ওয়াকফ বিলকে ছুতো করে চলছে হিন্দু সম্পত্তি ধ্বংস, হিন্দু খুনের মত পরিকল্পিত কার্যাবলী। রাজ্য প্রশাসন আদতে নীরব থেকে তাদের ভোট ব্যাঙ্ককে রক্ষা করছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনারা জোটবদ্ধ হন ও সঠিক রাজনৈতিক শক্তিকে সমর্থন করুন, যে শক্তি সুসংগঠিত ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই লড়াই কখনো ভাতের ছিল না; পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কখনো ভাতের অভাব ছিল না; শুধু ধর্মের কারণে তাদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। কোন ভাষিক পরিচিতি তাদের বাঁচাতে পারেনি; তাদের বিতাড়নের পিছনে যারা ছিল তারা সকলেই ছিল বাংলাভাষী। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে নোয়াখালী গণহত্যার মধ্য দিয়ে যে উদ্বাস্তু যাত্রার সূচনা ঘটেছিল আজও তার সমাপ্তি ঘটেনি; উদ্বাস্তু স্রোত এখনও সমান ভাবে বহমান। আজ মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের হিন্দুরা নদী পেরিয়ে মালদার বৈষ্ণবনগরের স্কুলে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এই উদ্বাস্তুরা হয়তো ওই ভাতের লড়াইয়ে বিশ্বাস করেছিল, ওই ভাষার পরিচয়ে বিশ্বাস করেছিল; তারা হয়তো ভেবেছিল পুলিশ তাদের রক্ষা করবে; কিন্তু পুলিশ তাদের রক্ষা করেনি, পূর্বেও কখনো করেনি, ভবিষ্যতেও কখনো করবে না। বাংলা সাহিত্য থেকে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এহেন সিদ্ধান্তের কারণ দেখিয়ে এই অনুচ্ছেদটি শেষ করব। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক মিহির সেনগুপ্তের উপন্যাস 'বিষাদবৃক্ষ'; ঘটনাকাল: পূর্ব পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী সময়। এক হিন্দু বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে ও ডাকাত দলের দ্বারা সেই বাড়ির কন্যা

ধর্ষিতা হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের পুলিশ তদন্তে এসেছে। তদন্তে এসে পুলিশ পুনরায় সেই কিশোরী কন্যাকে ধর্ষণ করে। তদন্তকারী দারোগা এক অভূতপূর্ব তত্ত্ব খাড়া করে: ওই ধর্ষিতা কিশোরী কন্যাটির সঙ্গে ডাকাত-ধর্ষকের 'মহব্বত' ছিল; ফলত: ওই কিশোরীই ওই 'ডাকাতি'টি করিয়েছে। পাঠক, আপনি কি ভাবছেন? উপন্যাস? সে তো গল্পকথা। চলে আসুন বাস্তবের মাটিতে। দুই বাংলাতেই এরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন। ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ চিনুন ও অন্যকে চেনান।

তাদের এহেন কার্যক্রমের পিছনে সব সময় একটি ছুতো থাকে; এক্ষেত্রে সেই ছুতো হল ওয়াকফ বিল। আজ সারা দেশের জনগণ দেখতে পাচ্ছে এই আইন পাশ হওয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে একটি অরাজকতা বিশৃঙ্খলার পরিবেশ রচিত হয়েছে; যেভাবে নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের সময় গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অবাধ লুটপাট, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের এক বিরাট কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছিল, হুবহু সেই একই কর্ম পরিকল্পনা। ওয়াকফ কী? ওয়াকফ ধারণাটি 'ইসলামী আইন ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি, এটি মসজিদ স্কুল হাসপাতাল বা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মতো দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একজন মুসলিম কর্তৃক প্রদত্ত দান কে বোঝায়' এবং 'একবার ওয়াকফের অর্থাৎ ওয়াকফের স্রষ্টার কাছ থেকে কোন সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ইসলামে বিশ্বাস অনুসারে যেহেতু ঈশ্বর চিরস্থায়ী তাই ওয়াকফ সম্পত্তিও তাই'। পূর্বতন ওয়াকফ আইনের ৪০ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোন সম্পত্তি ওয়াকফের কিনা, তা নির্ণয় করবে ওয়াকফ বোর্ড। দেশের কোন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কেবল এই মৌরসিপাট্টার সুযোগ নিয়ে তামিলনাড়ুর তিরুচেন্থুরাই গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক তার মেয়ের বিয়ের জন্য নিজের জমি বিক্রি করতে পারেননি, কারণ ওয়াকফ বোর্ড দাবি করেছিল পুরো গ্রামটিই নাকি তাদের সম্পত্তি! বিহারের গোবিন্দপুর গ্রামে, কর্ণাটকের বিজয়পুরা, বল্লারি, চিত্রদুর্গ, যাদগির ও ধরওয়াদেওতেও একই ঘটনা ঘটে। কেরলের এর্নাকুলামে ৬০০ খ্রিস্টান পরিবারের পৈতৃক জমি তারা দাবি করে বসে। কেরলের ঘটনাটির মধ্য দিয়ে বুঝতে পারা যায় যারা 'সংখ্যালঘু' স্বার্থ নিয়ে ঘোষিতভাবে সরব ও উচ্চকণ্ঠ, তারা 'সংখ্যালঘু' স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত নয়, কারণ তাদের কাছে খ্রিস্টানরা 'সংখ্যালঘু' নয়; কেবল একটি বিশেষ গোষ্ঠীই তাদের কাছে 'সংখ্যালঘু' এবং তারা সব সময় শুধুমাত্র সেই গোষ্ঠীর স্বার্থই পূরণ করে থাকে। সম্মানীয় পাঠক, আপনি ভাবুন একটি আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এই এই আইন এযাবৎকাল বহাল তবিয়তে প্রচলিত ছিল। তো স্বাভাবিকভাবেই, এই আইন সংশোধনের দরকার হয়ে পড়েছিল অনিবার্যভাবে। এই আইনে যে সংশোধনীগুলো নিয়ে আসা হয়েছে তার মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডে শিয়া সুন্নি সদস্যদের পাশাপাশি বোহরা ও আঘাখানি সম্প্রদায়ের সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রচিত হয়েছে; এছাড়া পঞ্চায়েত-পৌরসভা থেকেও সদস্য গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে; কেবল তাই নয়, মুসলিম নারী বিশেষভাবে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির কথা চিন্তা করে এই বিল রচিত হয়েছে। এক কথায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৫ এর একমাত্র লক্ষ্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বচ্ছ এবং জবাবদিহির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দেশের তথাকথিত 'প্রগতিশীল' 'অসাম্প্রদায়িক' 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক দলগুলি সমানাধিকার সূচক এই বিলের চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছে; কেবল তাই নয় সংসদ গৃহীত, ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত এই আইনকে প্রত্যাখ্যান ও অমান্য করার কথা ঘোষণা করেছেন ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। অভিজাত ক্ষমতাধর মুসলিম শ্রেণি থেকে দরিদ্র প্রান্তিক মুসলিমকে অন্তর্ভুক্তকরণের এই ওয়াকফ বিলকে ছুতো করে চলছে হিন্দু সম্পত্তি ধ্বংস, হিন্দু খুনের মত পরিকল্পিত কার্যাবলী। রাজ্য প্রশাসন আদতে নীরব থেকে তাদের ভোট ব্যাঙ্ককে রক্ষা করছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনারা জোটবদ্ধ হন ও সঠিক রাজনৈতিক শক্তিকে সমর্থন করুন, যে শক্তি সুসংগঠিত ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ আদর্শ পরিবেশ বজায় রাখবে।

এই ভারত রাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক দলটি জাতীয়তাবাদী, রাষ্ট্রবাদী রাজনীতির ধারক ও বাহক, সেই ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্দেশ্যে সামূহিক বিরোধী দলগুলির প্রদত্ত একটি বিশেষণ হল 'সাম্প্রদায়িক'। এই 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে? 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি এসেছে 'সম্প্রদায়' থেকে। নিজ সম্প্রদায়, নিজ গোষ্ঠী, নিজ ধর্মকে রক্ষা করা যে কোন ব্যক্তির পরম কর্তব্য। যদি অপর ধর্ম নিজ ধর্মের মানুষদের অনিষ্ট করে, তাহলে তাদের রক্ষা করা কি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে না? সম্মানীয় পাঠক, আপনার কি মনে হয়? 'সাম্প্রদায়িক' না 'উদ্বাস্তু', কোন বিশেষণটি আপনার পক্ষে সম্মানজনক হবে? কোন শব্দটি আপনার ধর্ম, সমাজ, গোষ্ঠীকে রক্ষা করবে? তা বিচারের দায়ভার একান্ত ভাবেই আপনার। তবে ভাবার সময় বেশি নেই, ওপার বাংলার মতই এপারেও হিন্দুদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সংঘবদ্ধ হোন, সঠিক রাজনীতিকে চিনে নিন, নইলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষমা করবে না।

ঋণ স্বীকার:

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ২০১৩, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

আবুল বারকাত ও অন্যান্য, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস, ২০০৯, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

মিহির সেনগুপ্ত, বিষাদবৃক্ষ, ২০০৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা

pib.gov.in

ভারতবিরোধী কম্যুনিস্টদের দ্বিচারিতা

নারায়ণ চক্রবর্তী

এই দ্বিচারিতা করা দেশ বিরোধী দলটিকে সমর্থন এবং প্রচার করা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নিজেদের স্বার্থেই বিরত থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের ভোট রাজনীতির দ্বিমেরু তত্ত্ব রাজ্যবাসীর কাছে গ্রহনীয় হলে রাজ্যের মঙ্গল।

গত ২২ থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। রাজ্যের প্রায় সব সংবাদ-মাধ্যম এই সম্মেলনের সংবাদ প্রচার করেছে। কিন্তু কেন? এমন গুরুত্ব তাদের দেওয়ার কারন কি? একথা বিচার করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় এবং ঘটনা মনে পড়ল। তারই প্রেক্ষিতে এখানে এই সম্মেলনের কথা বলা।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংসদীয় রাজনীতিতে সিপিএমের তেমন গুরুত্ব না থাকলেও এই দলটি যেমন লেলিন-স্ট্যালিনকে কবর খুঁড়ে টেনে আনে, তেমনি এ রাজ্যে কম্যুনিস্ট শিক্ষায় শিক্ষিত সাংবাদিককুল তাদের সংবাদ-মাধ্যমের মালিকদের "ডিপ স্টেট"-এর গুণগ্রাহীতার সুযোগে ভারতীয় রাজনীতিতে মৃত এই দলটিকে ভেন্টিলেশনে রেখে প্রচার চালাচ্ছে। হয়ত মনে প্রচ্ছন্ন আশা, কোনো হেকিমী চিকিৎসায় ফ্রাঙ্কেনস্টিন জেগে উঠবে!

সর্বভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে এরা গুরুত্বহীন কেন, তা বলতে গেলে এদের সাম্প্রতিক ভোট রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতে হয়। এরা যে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেখানে তাদের লোকসভায় আসন একটিমাত্র। আবার তামিলনাড়ুতে স্ট্যালিনের পদসেবা করে তারা তাদের রাজ্য থেকে দুটি আসন ভিক্ষে পেয়েছে। যে কংগ্রেসকে তারা একসময় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দী বলে প্রচার করত, তাদের নেত্রীর কাছে "দেহী পদপল্লবমুদারম" করে রাজস্থানে একটি আসন - সাকুল্যে লোকসভায় ৪টি আসন জোটাতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গে পরপর কয়েকটি নির্বাচনে বিধানসভা এবং লোকসভায় আসন সংখ্যা শূণ্য। তারা রাজনৈতিক যুদ্ধে শূণ্য থেকে মহাশূণ্যে বিলীন হওয়ার পথে।

তবু কিসের বাধ্যবাধকতায় সংবাদ-মাধ্যম তাদেরকে এত গুরুত্ব দেয়? এটা স্বাভাবিক নয়। অনেকে বলেন, এর জন্য ঐ দল এবং তাদের আগের নেতারা দায়ী। একদম ভাবের ঘরে চুরি করার মত একথা একদম ঠিক নয়। এই দলটির যতই পরিবর্তন করা হোক না কেন, এ সব পরিবর্তন সর্বদা নতুন পাত্রে পুরোনো মদ পরিবেশনের মত। তার কারন হচ্ছে, দলটির ভারতীয় রাজনীতিতে জন্মের ইতিহাস এবং এখানে পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে নিজেদের নীতির পরিবর্তন না করা। এই যে নিজেদের নীতিতে অবিচল থাকা, এই রাজনৈতিক সততাই দলটিকে ভারতীয় রাজনীতিতে অপাংক্তেয় করে তুলেছে।

১৯২০ সালে তাসখন্দে প্রথম ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় তার জেনারেল সেক্রেটারি হন ব্যার্থ খিলাফৎ আন্দোলনের জেহাদী সৈনিক মহম্মদ রফিক। তখন থেকেই এই দেশের কম্যুনিস্টদের কাজের দিক নির্দেশ তারা ঠিক করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৬২তে ভারতকে চিনের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে চিনের সমর্থনে এগিয়ে এসে একদল কমরেড কম্যুনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে সিপিএম তৈরী করলেও তাদের ভারত ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয় না। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির তাত্বিক নেতা ও জেনারেল সেক্রেটারি ড. গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস এখনো সিপিএমের পার্টি অফিসে রেখে দেওয়া। তাদের মূল নীতি হল, স্বাধীনতার পর ভারতকে গণতান্ত্রিক রিপাবলিক না মনে করে শুধুমাত্র ক্ষমতাশালী রাজ্যগুলির ফেডারেল রিপাবলিক মনে করা। তাদের তদানীন্তন শ্লোগান, "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, ভুলো মৎ" এর মধ্যে যে উদ্দেশ্য ছিল, তা হল, শক্তিশালী রাজ্য এবং দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার তৈরী। যেটা হলে ভারতকে ভেঙ্গে টুকরো করা সহজ হত। পাক-ই-স্তান গঠন ও পরবর্তী সময়ে পাক-ই-স্তানের ভারতের বিরুদ্ধাচরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত দেওয়া, চিনের সমস্ত ভারতবিরোধী পদক্ষেপের নিন্দা দুরস্ত, তার সঙ্গে সহমর্মীতা পোষণ করা, ভারতের যে কোন জাতীয়তাবাদী কাজের বিরোধীতা করা, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচারের মধ্যে দিয়ে ইসলামী ধর্মনিরপেক্ষতাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সব রকম মিথ্যাচার করা - এসব করতে করতে একসময় তারা ভারত বিরোধী বাইরের ও ভিতরের রাজনৈতিক শক্তিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে। যখন জনসাধারণ তাদের কথায় এবং কাজে দ্বিচারিতা ও দেশের integrityর বিরোধীতা দেখল, তখন তারা আস্তে আস্তে ভোট রাজনীতিতে এই দলটিকে রাজনীতির আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করল।

স্বাধীনতার এত বছর পরেও কম্যুনিস্টদের মধ্যে এখনো অর্থ ও সংবাদ-মাধ্যমের বদান্যতায় পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে টিঁকে আছে, তা হল এই সিপিএম। অন্য বাম দলগুলি হল দুর্গাপুজার প্যান্ডেলে কলাবউয়ের মত, আছে কিন্তু অনুভব করা যায় না! এই কম্যুনিস্টরা স্বাধীনতার সময়ে লিখিত বিবৃতিসহ প্রচার করত, আগে পাক-ই-স্তান গঠন, তারপর ভারতের স্বাধীনতা। এরা ১৯৪৬এর "দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং"-এর নায়ক সুরাবর্দীর সঙ্গে মুসলিম লীগের মঞ্চ আলো করে বসে সরাসরি হিন্দুহত্যায় মদত দিয়েছিল। এদের বক্তব্য ছিল, মুসলমানরা সর্বহারা (!), শোষিত এবং হিন্দুরা জাতিগতভাবে শোষক! সে সময়ের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কম্যুনিস্ট নেতাদের বক্তব্যে এসবের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাক, এসব তো তাদের নীতির প্রশ্ন! কিন্তু এই ভারত ও হিন্দু-বিদ্বেষী দলটির ইউএসপিই এখন এদের এই দেশে অস্তিত্ব বাঁচানোর প্রধান অন্তরায় হলেও এরা খালি সেটিং, কানেকশান ও ইজমের সহমর্মিতাকে ব্যবহার করে ভারতীয় রাজনীতিতে টিঁকে আছে। এক সময় সুভাষ চন্দ্র বোস বলেছিলেন, তাঁর যখন কোনো পদক্ষেপ বুঝতে অসুবিধা হত, তখন তিনি স্টেটসম্যান কাগজ কি লিখেছে সেটা পড়তেন! ঐ কাগজ যা বলছে, তিনি তার বিপরীত মত গ্রহণ করতেন! এভাবে বাংলা তথা দেশের মানুষ এই কম্যুনিস্টদের মতের বিপরীতে চলে বলেই এরা বর্তমানে পরজীবি রাজনীতি নির্ভর হচ্ছে। সে কারনেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের বছরখানেক আগে এরা আবার অজ্ঞাত জাদু স্পর্শে তেড়েফুঁড়ে জেগে উঠেছে! এদের এই রাজ্য সম্মেলনে কি ঘোড়ার মাথা না ঘোড়ার ডিম প্রস্তাব নেওয়া হল, তা সংবাদ-মাধ্যম কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলী হেলনে বড় করে 'সংবাদ' করছে। অতীতে-বর্তমানে-ভবিষ্যতে শূণ্য পাওয়া এই দলের প্রচারের উদ্দেশ্য একটাই। রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের নির্বাচনী বৈতরনী পার হতে এরা প্রভূত সাহায্য করছে এবং করবে।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে এদের মিথ্যাচার এবং দ্বিচারিতা নিয়ে নাটকের অঙ্ক ধরে ফেলা যায়। আগামী নির্বাচনেও একই নাটক অনুষ্ঠিত হবে, শুধুমাত্র নতুন বোতলে পুরোনো মদ পরিবেশনের মত করে। প্রথমে বলি, গত লোকসভা নির্বাচনের সময় সর্বভারতীয় স্তরে যে INDI alliance বা ইন্ডি জোট, যাকে বিরোধীরা দেশের ইংরেজী নাম INDIA বলে জাতীয় ফ্লেভার দিতে চেষ্টা করেছিল, তার প্রধান দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম ছিল। তারা সারা ভারতে জোট করায় সিপিএম তার সাকুল্যে ৪টি আসনের মধ্যে ৩টিতে জিত হাসিল করতে পেরেছে। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমলের সুবিধা করতে কংগ্রেস ও সিপিএম আলাদাভাবে প্রার্থী দিয়েছে। দেখা গেল কৌটো নাচিয়ে টাকা তোলা (!) দল সিপিএম এই রাজ্যে বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থী দিল। তাদের লোকসভা নির্বাচনের খরচ কে কিভাবে বহন করল? আবার তারা দুটি বাদে অন্য সব আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হলেও যে দুটিতে জামানত রাখতে পেরেছে, সেখানে তাদের নির্বাচনী ভূমিকা কেমন ছিল? এসব বিশ্লেষণ করলেই পুরো খেলাটা বোঝা যায়। তারা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যেমন কোনো প্রচার করেনি, তেমন হিন্দু এলাকায়, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত এলাকায় তেড়েফুঁড়ে প্রচার করেছে।

শুধু তাই নয়, তারা তাদের রাজনৈতিক শত্রুর গ্রেডেশান করে বলেছে বিজেপি তাদের এক নম্বর শত্রু! আবার তারা প্রস্তাব নিয়েছিল, নির্বাচনের পর দিল্লীতে ইন্ডি জোটের সরকার গঠনেও তারা থাকবে! অর্থাৎ, আমাকে ভোট দাও; না দিলে অন্তত তৃণমূলকে দাও। সেই আগের বিধানসভা নির্বাচনের সময় "নো ভোট টু বিজেপি" শ্লোগানের কার্যকরী রূপান্তর। এর কারনটা কি? প্রথমত, রাজ্যে তৃণমূলের সমর্থন ছাড়া এদের পক্ষে পার্টি অফিস খোলা সম্ভব নয়। এবং নীতিগতভাবে এরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং ভারতীয় অস্মিতার পক্ষাবলম্বনকারী সব রাজনৈতিক দলের বিরোধী। এ জায়গায় রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিপিএমের স্বাভাবিক বন্ধু হল তৃণমূল কংগ্রেস। এখন সারা দেশেই এই দলটি অন্য দলের প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে লেজুড়বৃত্তি করে টিঁকে আছে।

এ ধরনের দলের কর্পোরেট অনুদান বা বিশেষ আর্থিক অনুদান পাওয়ার কথা নয়। এরা যেহেতু ঘোষিত সর্বহারার পার্টি, এদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন কিভাবে মেটে? এই দলের দ্বিচারিতার আরো একটি উদাহরণ হল, দিল্লীতে আপের বিজেপির কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর এদের দলীয় দৈনিকে এরা লিখেছে যে, কংগ্রেস নাকি দিল্লিতে প্রার্থী দেওয়ায় ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারনে আপ বিজেপির কাছে হেরেছে! এ একদিকে যেমন ভাবের ঘরে চুরি, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে এক যুক্তি আর দিল্লীতে বিপরীত যুক্তি। যদিও কংগ্রেসের ভোটের সব ভোট আপে যায়, তাহলেও বিজেপির জিততে অসুবিধা হয় না। অন্ততঃ অঙ্ক তাই বলে। আর দিল্লীতে একদা যে দল থেকে মূখ্যমন্ত্রী হয়েছিল, সেই সর্বভারতীয় দল কংগ্রেস সেখানে আপের কাছে আত্মসমর্পন করে সেখানে দলকে আপের কাছে বন্ধক রাখবে, এদিকে একই যুক্তিতে সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ইন্ডি জোটের তৃণমূলকে সমর্থন করার কথা। তখন তারা কেন প্রার্থী দিচ্ছে? কারন, তাতে বিজেপির ক্ষতি আর তৃণমূলের লাভ। তাহলে, মহাশূণ্যে অবস্থান করা সিপিএম কাদের জন্য, কাদের দৌলতে, কাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়ছে?

এখানেই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকদের বুঝতে হবে নিজের স্বার্থ, রাজ্যের উন্নয়ণে কাকে ভোট দেবেন আর কোন ভোট কাটুয়াকে পরিত্যাগ করবেন। তাদের পরিপক্কতার উপর নির্ভর করবে রাজ্যের ভবিষ্যৎ। অথচ, এই সর্বহারার নেতারা যে সম্মেলন করলেন, তার প্রতিনিধিদের জন্য প্রস্তুত খাবারের তালিকা দেখলে চোখ কপালে উঠে যায়। চিংড়ি, কাতলাসহ কয়েক রকমের মাছ, ফাইন চালের ভাত, কয়েক রকমের মিষ্টি - যেন বিয়েবাড়ির ভুঁড়িভোজ! এ টাকা এলো কোথা থেকে? কাদের বদান্যতায়?

এই সম্মেলনে সিপিএম তাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৮০ জন সদস্যকে নিয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ১৪ জন মহিলা সদস্য! অথচ, এরা বলে যে, এরা নাকি দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দল, যারা নারীর সশক্তিকরনের কথা বলে! এরা বিজেপিকে মনুবাদী, পুরুষতান্ত্রিক এবং কংগ্রেসকেও এ বিষয়ে সমালোচনা করে। অথচ, নিজেরা শুধু পুরুষতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সংগঠন ধরে রাখে না, পলিত কেশ বৃদ্ধদের "পলিট ব্যুরো" নামের উপরে দলের সবক্ষমতা ন্যস্ত করে থাকে।

এই দ্বিচারিতা করা দেশ বিরোধী দলটিকে সমর্থন এবং তার প্রচার করা থেকে রাজ্যের মানুষকে নিজেদের স্বার্থেই বিরত থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের ভোট রাজনীতির দ্বিমেরু তত্ত্বই রাজ্যবাসীর কাছে গ্রহনীয় হলে রাজ্যের মঙ্গল।

ফেক নিউজ

নিট পরীক্ষা নিয়ে তৃণমূলের ঢপের চপ

ব্যাকগ্রাউন্ড:- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আল আমিন মিশনের মত কিছু বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য একটা সিস্টেম। তাই সর্বভারতীয় স্তরে নিট শুরু হওয়ার পর সবথেকে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। স্বভাবগত ভঙ্গিতে সময় অসময়ে অজস্র মিথ্যা কথা তিনি বলতেন এই পরীক্ষা নিয়ে। যেমন কিছুদিন আগেই শিক্ষক নিয়োগে আকাশছোঁয়া দুর্নীতির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিট-এর কথা বলেছেন তিনি। যদিও কিসের দুর্নীতি কিভাবে দুর্নীতি সেটা তিনি বা তাঁর দলের কেউ জানাতে পারেন নি।

মিথ্যে খবর:- বিজেপি বিরোধী টিম এবং তাদের ফান্ডে চলা কিছু মিডিয়া হাউস প্রচার করতে আরম্ভ করে নিট-এর তারিখ নাকি পিছিয়ে গেছে। সঙ্গে আরো বেশ কিছু মিথ্যা খবর যার উদ্দেশ্য ছিল একটা অস্থিরতা তৈরি করা।

সত্যি খবর:- নিট পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে আগের তারিখেই হবে।

তৎকাল টিকিটের বুকিং-এর সময়ে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না

ব্যাকগ্রাউন্ড:- ভারতের যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সব থেকে বেশি চক্রান্ত এবং ফেক নিউজের সম্মুখীন হয় তা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে। কখনো দুর্ঘটনা করানোর জন্য চক্রান্ত আর কখনো মিথ্যা খবর জড়িয়ে জনসাধারণকে উস্কে দেওয়া - এই দুই জোড়া নোংরা খেলা বিরোধীদের দীর্ঘদিনের অস্ত্র। আর যেহেতু এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে টিকিট পাওয়া একটা কঠিন কাজ তাই এই সংক্রান্ত বিষয়ে মিথ্যে খবর ছড়িয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা বেশ সহজ নীতিহীন বিরোধিতার জন্যে।

মিথ্যে খবর:- বলা হচ্ছে রেল নাকি তৎকাল টিকিটের বুকিংয়ের সময়ে বেশ কিছু পরিবর্তন করেছে। পরিবর্তনের যে ফেক নিউজ বাজারে ঘুরছে তাতে দেখা যাচ্ছে তৎকাল টিকিটের আধ ঘন্টা আগে প্রিমিয়াম তৎকাল টিকিটের বুকিং শুরু হয়ে যাবে। এরকম তাহলে অনেকেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে এই মিথ্যে খবরে ক্ষোভের জন্ম নিয়েছে।

সত্যি খবর:- এরকম কোনো নোটিশ রেল বের করেনি। যেটা প্রচার হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ ভুল।

ভারতীয় রেল নিয়ে বাম গ্যাস-বেলুন

ব্যাকগ্রাউন্ড:- ব্যাংকের পরেই সব থেকে বেশি পরিষেবা প্রদানকারী সরকারি সংস্থা হল ভারতীয় রেল। রেল যাত্রী পরিবহনের একটা বড় অংশ ভর্তুকি দিয়ে চালায়। কারণ ভারতের বেশিরভাগ মানুষের জীবনযাত্রাই রেলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই রেল সম্পর্কিত ফেক নিউজের ঋনাত্মক প্রভাব ভারতীয় জীবন যাত্রায় অনেক। আর অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত কারণে ভিড় যেহেতু স্বাভাবিক কিন্তু চিন্তাজনক একটি বিষয়, তাই ভিড় নিয়ে মিথ্যা কিছু রটালে সাধারণ মানুষের অনেকেই সেটা বিশ্বাস করে নেয়।

মিথ্যে খবর:- বেশ কিছু বাম তৃণমূল পরিচালিত মিডিয়া হাউস থেকে দাবী করা হচ্ছে ২০০ জন সাধারণ যাত্রী নাকি দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে মারা গেছে।

সত্যি খবর:- এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে।

ব্যাংক নিয়ে বিরোধীদের গুলবাজি

ব্যাকগ্রাউন্ড:- যে সংস্থা যত বেশি গণপরিষেবার কাজে যুক্ত তাদের নিয়ে ফেক নিউজ ছড়ানোর প্রবণতাও বিরোধীদের তত বেশি। কষ্টার্জিত অর্থ যেহেতু মানুষের প্রাণের সমানপ্রিয় তাই ব্যাংক নিয়ে কোন ফেক খবর ছড়ালে মানুষের মনে একই সাথে ভয় এবং চিন্তার উদ্বেগ হয়।

মিথ্যে খবর:- দুটো মিথ্যা খবর একই সঙ্গে জোর কদমে ছড়িয়েছে বিরোধীরা। প্রথমটায় বলা হচ্ছে কারুর একের বেশি ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে জরিমানা করা হবে। দ্বিতীয়টায় দাবি করা হচ্ছে সরকার নাকি ঘোষণা করে দিয়েছে এবার থেকে ব্যাংক সপ্তাহে পাঁচ দিন খোলা থাকবে। অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় এবং পঞ্চম শনিবারও ব্যাংক বন্ধ থাকবে।

সত্যি খবর:- প্রথমটা সর্বৈবভাবে মিথ্যে। একের বেশি একাউন্ট থাকলে জরিমানার কোনো বিষয় নেই। আর দ্বিতীয়টা ব্যাংক কর্মচারীদের দাবি। সরকার এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাই বিজোড় শনিবারগুলোয় ব্যাংক যথারীতি খোলা থাকবে

নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি জেলা সভাপতি

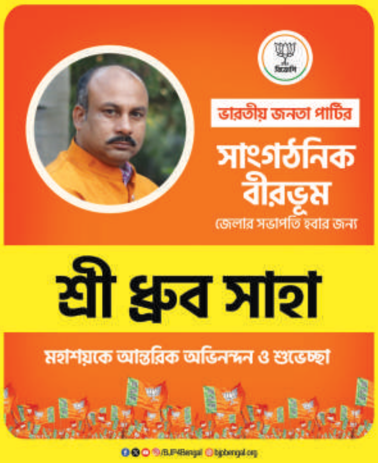

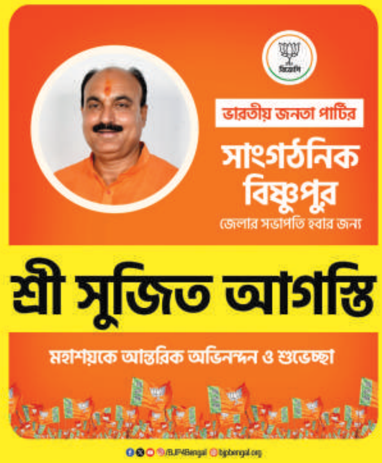

নয়াদিল্লির বিজেপি সদর দফতরে ওয়াকফ সংস্কার নিয়ে জন সচেতনতা কর্মশালায় বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জগত প্রকাশ নাড্ডা।

তামিলনাড়ুতে রামনবমীর দিনে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নতুন পামবান রেলওয়ে ব্রিজ। সূচনা হল রামেশ্বরম-টামবারাম ট্রেন পরিষেবার।

তামিলনাড়ুতে জোট সঙ্গী এডিএমকে নেতৃত্বের সঙ্গে বিজেপি নেতা শ্রী অমিত শাহ।

উড়িষ্যার তালচের-এ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র প্রধান-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহ।

৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসে নয়াদিল্লীতে দলের সদর দফতরে পতাকা উত্তোলন করলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জে পি নাড্ডা ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।